মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

তোমার স্মরণে হে রাসূল!

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

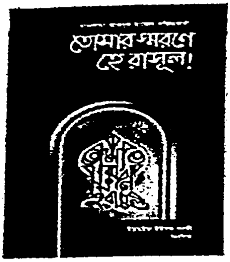

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.। কোনো দূর মুলুকে নয়, আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি। জন্ম মার্চ ১৮৯২ সালে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত দরিয়াবাদ শহরে। বড়ো শক্তিশালী কলমের অধিকারী ছিলেন তিনি। যা লিখতে চাইতেন তাই লিখতে পারতেন- বিস্ময়কর বৈশিষ্টমণ্ডিত ভংগি ও ধারায়। তথ্য ও তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটতো তাঁর লেখায়। যে বিষয়েই তিনি কলম ধরতেন, তাই হয়ে উঠতো তাঁর কলমের ছোঁয়ায় বাঙ্ময় .. প্রাণময়। অনেক লম্বা কথা বলতেন তিনি অনেক অল্প কথায়। তাঁর একেকটি বাক্য যেনো একেকটি কিতাব। প্রায় এক যুগ তিনি হযরত থানভী রহ. এর সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন। থানাভবন ছিলো তাঁর প্রাণকেন্দ্র। হযরত থানভী রহ.কে নিয়ে লিখেছেন তিনি অমর হাকীমুল উম্মত। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কিতাব সফরে হিজায। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন- 'ও আপনে তরযকে বানি আওর খাতেম হ্যা'- তিনি যে ধারায় লিখতেন সে ছিলো শুধুই তাঁর ধারা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে সেই ধারা। কেউ আর পারবে না তাঁর মতো এমন সুন্দর করে লিখতে। কুরআন ছিলো তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। তাই তাঁর তাফসীরপ্রেমী কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই ভাষায় এক অমর কিতাব–তাফসীরে মাজেদী!

১৯৭৪ সালে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন নি। ১৯৭৭ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ....

অনুবাদক পরিচিতি

নাম : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
পিতা : ইউসুফ বিন হাতিম রহ.
শিক্ষা :

* হিফযুল কুরআন : মাদরাসায়ে নূরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা

* এসো আরবী শিখি থেকে জালালাইন : মাদরাসায়ে নূরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা

* মিশকাত : জামেআ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা

* দাওরায়ে হাদীস : দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত

শিক্ষক : মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, শ্যামলী, ঢাকা

প্রকাশিত গ্রন্থ :

১. আলোর দিগন্তে- হযরত উমর রা. (অনুবাদ)
২. আল কালিমাত (অনুবাদ)
৩. শিশু-কিশোর সীরাত সিরিজ ১-১০
৪. তুমি সেই রানী (অনুবাদ)
৫. গল্পে আঁকা ইতিহাস ১-৭ (অনুবাদ)
৬. রমজান আমার ভালোবাসা
৭. আবু গারিবের বন্দি (অনুবাদ)
৮. জীবন গড়ার গল্প ১-৩
৯. তুমি সেই রাজ .. তুমি সেই রানী .. (অনুবাদ)
১০. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ এমন ছিলেন তিনি (অনুবাদ)

প্রকাশের অপেক্ষায় :

১. গল্পে আঁকা সীরাত
২. আশারায়ে মুবাশশারা ১-১০

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

রাসূলকে নিবেদিত ভালোবাসার পংক্তিমালা ঃ

তোমার স্মরণে হে রাসূল!

(পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ)

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী অনূদিত

রাহনুমা প্রকাশনী™

রাসূলকে নিবেদিত ভালোবাসার পংক্তিমালা ঃ

তোমার স্মরণে হে রাসূল!

মূল : মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশক	: রাহনুমা প্রকাশনী মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯
স্বত্ব	: সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	: ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্রকাশনা সংখ্যা	: ৬
প্রচ্ছদ ক্যালিওগ্রাফী	: সলেহ মুহসিন, রাজশাহী, ০১৭১৮-৯০০৫৬৬

ISBN 978-984-33-3779-5

মূল্য : ১৬০/- (একশত ষাট টাকা মাত্র)

অনুবাদকের কথা

এক.

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার স্বর্গীয় আঙ্গিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে ক'দিন পরেই। ভাবছিলাম যাবার বেলা সঙ্গে করে কী নিয়ে যাবো। মূলত অনুবাদ করার মতো একটা কিতাব খোঁজ করছিলাম। কিন্তু খুঁজতে হলো না। মনে পড়ে গেলো ঐ কিতাবটার কথা, আসরের পর নদওয়ার মসজিদে প্রায়ই তা'লিম হয় যে কিতাবটা। সবাই উপস্থিত থাকেন। এমন কি শায়খ নদভীও। কখনো তারিক ভাই কখনো আবদুল্লাহ ওয়াসিম তা'লিম করে। সবাই তখন উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। তন্ময়চিত্তে শুনতে থাকেন। আমি তা'লিম শুনতে শুনতে আত্মসমাহিত হয়ে যেতাম!

কী সুন্দর সুন্দর কথা!

কী মিষ্টি মিষ্টি ভাষা!

কী আলংকারিক শিল্প-সুষমা!

রাসূল প্রেমের কী জ্যোতির্ময় উদ্ভাস!

সেই তা'লিম শুনতে শুনতে মনে হতো— সবার হৃদয়ের গভীর থেকে যেনো উচ্চারিত হচ্ছে নিঃশব্দে— হে রাসূল! আমরা তোমাকে ভালোবাসি! আমি যেনো শুনতে পেতাম সে নিঃশব্দ উচ্চারণ!

দুই.

কিতাবটা সংগ্রহ করলাম নদওয়ার বিশাল ক্রয় কেন্দ্র থেকে। নাম *যিকরে রাসূল*। সত্যি কথা বলতে কি; *যিকরে রাসূল* নামটিই আমাকে প্রবলভাবে কাছে টানলো। আমি একটু নির্জনতা খুঁজলাম। কিতাবটি নিয়ে বসলাম। বিসমিল্লাহ বলে খুললাম। একটু একটু

করে পড়তে লাগলাম। তা'লিমে বসার সুবাদে বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় তো আমার আগেই ছিলো। কিন্তু সে ছিলো শোনে শোনে। এবার শুরু হলো দেখে-দেখে .. পড়ে-পড়ে। আগের পরিচয় ছাপিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠলো এ-পরিচয়। আমি গভীরে প্রবেশ করতে লাগলাম। দেখলাম, এর ছত্রে-ছত্রে যেনো ছলছল প্রবাহে বয়ে যাচ্ছে রাসূল-প্রেমের ঝরনাধারা। আর সেখানে পাঠকসহ সাঁতার কাটছেন মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। আমিও সাঁতার কাটলাম। মনভরে। চিত্তৃপ্তির অমৃত স্বাদ নিয়ে নিয়ে।

তিন.

তারপর শুরু হলো অনুবাদ। আমার জীবনের দ্বিতীয় অভিযান। সে অভিযানে আমি ছিলাম একা—নিঃসঙ্গ। তবে ...

সাহস আমার সঙ্গে ছিলো।

সংকল্প আমার পাশে ছিলো।

দৃঢ়তা আমার সামনে ছিলো।

'আলোকিত মুখ' আমার পেছনে ছিলো।

আল্লাহ্‌র তাওফিক আমার চারপাশেই ছিলো!

তাই এ অভিযানের 'এভারেস্ট-উচ্চতা' আমাকে একেবারেই ভাবালো না, হতোদ্যম করে দিলো না। আমি অগ্রসর হতে লাগলাম .....।

এক সময় পরিণতির বর্ণোজ্জ্বল আকাশটা ফর্সা হয়ে এলো। অভিযান সমাপ্তির কাঙ্ক্ষিত লগ্নটা একেবারে কাছে চলে এলো। আরো কাছে। দূরত্ব কমতে কমতে নেই-ই হয়ে গেলো! আল-হামদুলিল্লাহ!!

চার.

কিন্তু সময় হওয়ার আগেই কেনো ছিলো এক কিশোর-তরুণের সেই বড় অভিযান? .. কারণ তার ভিতরে

'জীবাণু' ছিলো। চির-দুর্বিনীত 'জীবাণু'। রাসূলকে ভালোবাসার 'জীবাণু'। এমন 'জীবাণু', কে-না হৃদয়ে পুষতে চায়? এখানে 'সময়ের প্রাচীর' খাড়া হয়ে থাকতে পারে না। বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই বলি— এমন 'জীবাণু'র 'এ্যান্টিবায়োটিক' নিপাত যাক, ধ্বংস হোক!

তা ছাড়া ..

রাসূল প্রেমের স্তুতিগান গেয়েছেন যাঁরা ..

রাসূল প্রেমের স্রোতস্বিনীতে সাঁতার কেটেছেন যাঁরা ..

রাসূলে আরাবির জীবন-চরিত রচনা করার গৌরব অর্জন করেছেন যাঁরা ..

তাঁদের সেই মুবারক মাহফিলের এক কোণে একটু জায়গা করে নেয়ার বাসনা লালন করছিলাম আমিও অনেক দিন থেকে! রোজ হাশরে আল্লাহ এঁদের নাম ধরে ডাক দিলে ... 'সেই কোণে-বসা আমি'ও যদি 'সেই ডাক-শোনে লাব্বাইক বলা'দের দলে পড়ে যাই!!

পাঁচ.

সীরাতুন্নবী আমার প্রিয় বিষয়। এ বিষয়ে লিখতে পারলে আমি চেতনা ফিরে পাই। সাহস ফিরে আসে মনে। চেতনা হারানোর .. সাহস হারানোর কতো কী আছে এই মাটির পৃথিবীতে, যা আমাদেরকে বারবার দূরে নিয়ে যায়। দুঃখে ফেলে দেয়। জীবনের স্বস্তিকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। তখন প্রিয় রাসূলের কাছে চলে যেতে পারলে সব দূর হয়ে যায়। সব গ্লানি মোছে যায়। সব কাঁটা ফুল হয়ে যায়। কণ্টকাকীর্ণ পথ হয়ে যায় কুসুমাস্তীর্ণ। জীবন হেসে উঠে উচ্ছলতায়। এ জন্যেই রাসূলের সান্নিধ্য-পরশে জাহিলী যুগের আঁধার-আচ্ছন্ন মানুষগুলো হয়ে গিয়েছিলেন এমন

সোনার মানুষ, পৃথিবী-ভরা সোনা দিয়েও যাঁদের কারো মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হবে না! ....

ছয়.

একজন শক্তিমান লেখক ও সাহিত্যিকের কলমে এ কিতাব রচিত। ফলে বিষয়ের গভীরতা এখানে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে— শিল্পের সুষমায়। তাই সব মিলিয়ে এ কিতাব ইসলামী সাহিত্যেরও একটি সেরা নমুনা। ইসলামী সাহিত্যের মহান রূপকার সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সশ্রদ্ধচিত্তে লেখককে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই বলে— 'তাঁর লেখার ভঙ্গি ও ধারার রূপকার শুধু তিনিই একা। তাই এ-ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এখন তাঁর মতো আর কেউ লিখতে পারবেন না।'

সাত.

হে আল্লাহ! তোমার 'হাবীব'-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ খেদমত কবুল করে নাও! পরকালে আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দাও!

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

উৎসর্গ

আরব-আজম—সর্বত্র সাড়া-জাগানো গ্রন্থ *'মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো'* লেখার জোর প্রস্তুতি চলছিলো। শায়খ নদভী এ জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার চষে বেড়াচ্ছেন। যেতে চাইলেন মাওলানা দরিয়াবাদীর কাছেও। তাঁর কাছে অনেক তথ্য আছে। অনেক তত্ত্ব আছে। তাঁর গ্রন্থাগারে অনেক প্রয়োজনীয় উৎসগ্রন্থ আছে। চিঠি লিখলেন যুবক নদভী শায়খ দরিয়াবাদীকে—

: হযরত! আমি এ উদ্দেশ্যে একটু আসতে চাই!

: চলে এসো!

একদিন সকালে দরিয়াবাদ পৌঁছার পর দু'জনের মাঝে এই কথা হলো ঃ

: ক'দিন সময় নিয়ে এলে?

: হযরত! শুধু আজকের দিনটা থাকবো।

: দুপুরের খাবার কখন খাবে?

: হযরত! দুপুরে আমি খেতে চাচ্ছি না। এই প্রচণ্ড গরমে খেলে আমি সময়টা কাজে লাগাতে পারবো না।

তারপর বিদায় নিয়ে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী গ্রন্থাগারে চলে গেলেন। নিজের কাজে ডুবে গেলেন। বিশেষ করে মাওলানা দরিয়াবাদী সম্পাদিত পত্রিকা—*সাচ্*-এর পুরোনো সংখ্যাগুলো একে একে ঘাটতে লাগলেন।

হঠাৎ পেছনে মৃদু পদ্ধ্বনি। মাওলানা নদভী দেখলেন— তাজা ইক্ষু-রসের গ্লাস নিয়ে খোদ শায়খ দরিয়াবাদী দাঁড়িয়ে আছেন! হাসিমুখে বললেন ঃ

: এটা কিন্তু খাবার-তালিকায় পড়ে না! প্রচণ্ড গরম, স্বাচ্ছন্দে 'খেয়ে' নিতে পারো! এতে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না!

মাওলানা বিস্ময়াপ্লুত হয়ে তা গ্রহণ করলেন!

একটু পর—ঘন্টা দুয়েক পর। আবার এলেন শায়খ
দরিয়াবাদী! এবার তাঁর হাতে লাচ্ছি'র গ্লাস!
তারপর আবার!
এবার শরবত!
বিস্ময়াবিষ্ট নদভীর চোখের তারায় ফুটে উঠলো
হাজারো কৃতজ্ঞতা!
বিমুগ্ধ নদভী'র ভাষায়—
'আমি 'প্রাজ্ঞ' মেজবানের বিস্ময়কর
মেহমানদারীতে আপ্লুত হতে লাগলাম! সত্যি কথা
হলো, যদি একটু পর পর এ-স্বস্তিকর ও স্বাস্থ্যকর
পানীয় না আসতো, তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে
আমার এ চিন্তা-কর্ম চালিয়ে যেতে পারতাম না।
এবং একটু আগের না-খাওয়ার 'বীরদর্পী' পূর্ব-
ঘোষণার জন্যে নিশ্চিত আমাকে পস্তাতে হতো!
অথচ কুশলী মেজবানের উপযোগী মেহমানদারির
বরকত, আমার নব-যৌবন, আমার পরিশ্রম-
প্রবণতা ও গরমের দীর্ঘ লম্বা দিন— সব মিলিয়ে
কী সুন্দরভাবে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আমি কাজ শেষ করে
ফেললাম!'

প্রিয় পাঠক!
কী ভাবছেন, উপরের পংক্তিগুলো পড়ে?
ভাবতে থাকুন! নিশ্চিত উন্মোচিত হবে অনেক
দিগন্ত—শিক্ষার অজানা দিগন্ত!
আমি *ঐ মেজবান আর ঐ মেহমানের* উদ্দেশ্যেই
উৎসর্গ করলাম এ-কিতাব!!
আমার দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ ঃ
তাঁরা সুরভিত ফুল ছিলেন!
এমন ফুল বারবার ফোটে না!!
যদি ফুটতো!!!

সূচীপত্র

- মৃতপুরীতে জীবনের ছোঁয়া- ১৩
- এতিমের রাজত্ব- ৩১
- এতিমের জয়- ৪৪
- দু'টি পথ- ৫৮
- রাসূলের আলোচনার সমুচ্চতা- ৬৯
- সীরাতে নববী এবং প্রাচ্যবিদ্বানবর্গ- ৭৮
- শোনো হে প্রিয়তম!- ৮৯
- তাসাওউফে মুহাম্মদী- ৯৯
- ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক- ১০৬
- প্রিয়তমের তিরস্কার- ১১৮
- জন্মকাল সম্পর্কিত রিওয়ায়াত- ১২৪
- নাকের দাগ- ১৩১
- সর্বোত্তম আদর্শ- ১৪৩
- সৌভাগ্যময় জন্ম- ১৫০
- রহমাতুল-লিল-আ'লামীন- ১৫৭
- এতিমের ওলী গোলামের মাওলা- ১৬৩
- তোমার স্মরণে হে রাসূল!- ১৬৭

মৃতপুরীতে জীবনের ছোঁয়া

গোমরাহির কালো চাদরে আচ্ছন্ন পৃথিবী

সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই জীবনের ছোঁয়া পেয়ে পৃথিবীতে চোখ মেলে চলেছে মানুষ। কিন্তু জীবন্ত এ-মানুষকেই কখনো কখনো মনে হয় জীবনের স্পন্দনশূন্য—মৃত। সৃষ্টিগতভাবে পৃথিবীটা ছিলো আলো ঝলমলে। কিন্তু আলো-ঝলমল এ-পৃথিবীটাই কখনো কখনো আচ্ছন্ন হয়ে যায় তিমির আঁধারে। বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আগমন ঘটেছে বড় বড় পথ প্রদর্শক ও জীবন পথের দিশারী—রাহনুমার। সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাঁরা সকলেই। অনেক দিন ধরেই হিদায়াতের নূর ও আলো থেকে পৃথিবী বঞ্চিত। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি হয়েছে। সবুজ শ্যামলিমায় পৃথিবী ভরে উঠেছে। কিন্তু বারিবর্ষণের সুদীর্ঘ বিরতির ফলে পৃথিবী এখন খরাগ্রস্ত উত্তপ্ত মরু, দারুণ পিপাসায় তার ঠোঁটে জমেছে শুষ্ক ত্বকের আস্তরণ।

সেই কবে এসেছিলেন হযরত ঈসা আ.। সাড়ে পাঁচশ বছর আগে। পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন নূর ও হিদায়াতের ফল্গুধারা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। দিনের আলোতে পৃথিবী এখন আর ঝলমলিয়ে ওঠে না। বিশ্ব মানবতাকে ঢেকে ফেলেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কালো চাদর। বিশেষ কোনো অঞ্চল নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন আঁধারের সর্বগ্রাসী বিস্তার। কোথাও নেই আলোর ছিটেফোঁটা। এমনকি সূর্যোদয়ের পর পূর্ব দিগন্ত এবং সুর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্ত— সব-ই ভ্রান্তি ও গোমরাহির কালো চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। জলে-স্থলে সর্বত্র ফাসাদ আর ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। আরব-আজম ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হচ্ছে আত্মিক ও নৈতিক জীবনের বিপর্যয় আর বিপর্যয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.

'মানুষের কৃতকর্মের দরুনই জলে-স্থলে—সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।
-রোম: ৪১

অন্যায়-অনাচার, পাপ-পংকিলতা, কামুকতা ও স্বার্থান্ধতার কলুষতা ও বিষ-বাষ্পে মারাত্মকরূপে পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত হয়ে আছে সৃষ্টির সেরা এই মানুষের আবাসভূমি।

বঞ্চিত আরব

বিশ্বব্যাপী বিরাজিত এই মানবতা-বিধ্বংসী অবস্থার ফলে এমনই ছিলো বিশ্ব মানবতার নাজেহাল অবস্থা। এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমের যে অংশটুকু আরব নামে অভিহিত, বিশেষভাবে তার অবস্থা ছিলো সর্বাধিক শোচনীয়। প্রাকৃতিকভাবে এ ভূ-খণ্ড যেমন ছিলো অনাবাদ ও চাষাবাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সম্ভবত তেমনি তা বঞ্চিত ছিলো কুদরতের রূহানী ও অকৃপণ দান থেকেও। সে ভূ-খণ্ডের ধ্বংসাত্মক অপকর্ম ও দুর্ভাগ্য সারা পৃথিবীর জন্য এক শিক্ষণীয় নমুনা। জরাগ্রস্ত তো সারা পৃথিবীই। কিন্তু আরবের বাসিন্দারা যেনো দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের শিকার। দুর্ভিক্ষ তো পৃথিবীর সর্বত্রই বিস্তৃত। কিন্তু এখানে তার রূপ যেনো ভয়াল। অবর্ণনীয়। নৈতিক অবক্ষয় ও চরিত্রহীনতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের আত্মিক ব্যাধি এমন গভীরে পৌঁছে গেছে যে, মনে হচ্ছিলো এর কোনো চিকিৎসাই নেই। তাদের নাফরমানি, ধ্বংসাত্মক অপকর্ম, আল্লাহ-বিস্মৃতি, আকীদার বিপর্যয় ও নিরর্থক কর্মকাণ্ড— তাদেরকে এমন নীচু পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিলো যে, তাদের সংশোধন ছিলো মানব ক্ষমতার বাইরে।

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ .

‘বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফেকিতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেই সব বিধি-বিধান জানারও একদম অযোগ্য যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন।’ -তাওবা: ৯৭

হিদায়াত ও ন্যায়ের দিশা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, সুকুমারবৃত্তি ও সচ্চরিত্রতা— সবকিছু থেকেই তারা অনেক দূরে সরে পড়েছে। এখন তো অবস্থা এতোদূর গড়িয়েছে যে, একটি মাত্র শব্দ দিয়েই বর্ণনা করা যেতে পারে তাদের সমগ্র জীবন-যাত্রার সারকথা। তা হল— ‘ভ্রান্তি’। কী ধরনের ভ্রান্তি? উত্তর লক্ষ্য করুন কুরআনের ভাষায়—

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

'সুনিশ্চিতই তারা ইতিপূর্বে ছিলো স্পষ্ট-সমুজ্জ্বল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।'

-আলে ইমরানঃ ১৬৪

অর্থাৎ যাতে কোনো দ্ব্যর্থতা, মতভেদ ও কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই।

আত্মিক যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে মানব জীবনের যাবতীয় সংশোধন ও সংস্কারের বিষয়টি। হৃদয়ের জমিন যদি কোমল ও পেলব থাকে তবেই আশা করা যেতে পারে সংস্কারের। কিন্তু আরবের সেই হতভাগারা তাবৎ মানবীয় গুণাবলী ও সুকুমারবৃত্তির সবুজ কোমল দুর্বাগুলো দু'পায়-দলে এখন এমন হিংস্র শ্বাপদে পরিণত হয়েছে, যাদের হৃদয়-মনে দয়া-মায়া ও স্নেহ-ভালোবাসার কোনো স্থান নেই। সেই কবেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তাদের হৃদয়ের গভীরে ছলছল প্রবাহে প্রবহমান— মানবতার ঝরনাগুলো।

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

'এখন তা (হৃদয়) পাথরের মতো পাষাণ অথবা তদপেক্ষাও কঠিন'।

-বাকারা: ৭৪

তাদের হৃদয় এখন পাথরের মতো শক্ত। বরং পাথরকেও তারা হার মানিয়েছে। নিজ হাতে তারা রুদ্ধ করে দিয়েছে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের ভুবনে প্রবেশ করার কপাটগুলো—একে একে। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, আর অনাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার দরুন সম্পূর্ণ বদলে গেছে তাদের মন-মানসিকতা। বিকৃত হয়ে গেছে তাদের রুচিবোধ ও চিন্তাধারা। হক ও বাতিলের মধ্যে, ভালো ও মন্দের ভিতরে এবং আলো ও আঁধারের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতাটুকুও আজ আর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.

'তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়। বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট'।

-আরাফ: ১৭৯

প্রকৃতই নির্বুদ্ধিতা, অপরিণামদর্শিতা ও সংকীর্ণতায় জানোয়ারকেও হার মানিয়েছিলো তারা।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা

এতোক্ষণ যা বিবৃত হলো তা ছিলো সেই মহান কিতাবের বরাতে, যা সব রকমের অতিশয়োক্তি ও বাড়াবাড়ি থেকে চিরপবিত্র। যার একেকটি হরফ সত্য, বাস্তবতার সর্বোচ্চ নমুনা। তারপরও প্রিয় পাঠকের কাছে ব্যাপারটি সহজবোধ্য হওয়ার জন্যে সে-সময়কার উজ্জ্বল চিন্তার অধিকারী দক্ষ ইতিহাস বিশ্লেষকদের বর্ণনার প্রতিও কিছুটা নজর দেয়া যাক—

'জাহেলী যুগের ১৭০০টি যুদ্ধের প্রসিদ্ধি অব্যাহত ছিলো। প্রচণ্ড শত্রুতা ও জিঘাংসা নিয়ে যুগ-যুগ ধরে গৃহযুদ্ধের মতোই চলতে থাকতো সে-সব যুদ্ধের জের। এক গোত্রের লোকেরা আরেক গোত্রের অতীতের তুচ্ছ ঘটনাকে যদি একটু ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় কবিতায় উল্লেখ করতো, তাহলে অপর গোত্রের লোকেরা খাপখোলা তলোয়ার হাতে তৈরী হয়ে যেতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্যে। কথায় কথায় মাতৃ-জাতি সম্পর্কে অপমানকর উক্তি করা হতো। কেউ যদি সামান্যতম বাড়াবাড়িও করতো এবং অপমানকর কথা বলতো তাহলে আর রক্ষে ছিলো না, একেবারে সেই অপরাধীর রক্তপাত ছাড়া তাদের তরবারি আর খাপে ফিরে যেতো না। আর এ-সব যুদ্ধের সবচে' বড় অভিশাপ ছিলো এই যে, তা একবার বেধে গেলে যুগ-যুগ ধরে চলতেই থাকতো— প্রতিশোধের ধারাবাহিকতায়।'

উপরের কথাগুলো বলেছেন বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন।[১]

'মক্কা এবং আরব-বদ্বীপ সুদীর্ঘ কাল ধরে ঘুমিয়ে ছিলো রূহানী মৃত্যুর কোলে— অচেতন হয়ে। ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম এবং বুদ্ধি ও যুক্তি তাদের মন ও মননে কেবল ততোটুকুই নাড়া দিতে পেরেছিলো, যেমন একটি প্রশান্ত ঝিলের বুকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে দু'য়েকটি ঢেউ আন্দোলিত হয় আর পানির নিচের অংশ থাকে একেবারেই স্থির—শান্ত। এরা খেয়াল খুশির হাতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছিলো। ডুবে গিয়েছিলো দুর্ভাগ্য ও অপকর্মের গভীরে। তাদের মধ্যে সাধারণ প্রথা ছিলো— পিতা মারা গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির পাশাপাশি লাভ করতো পিতার বিধবা স্ত্রীকেও। দারিদ্রের ভয়ে আপন 'কন্যা সন্তানকে মাটির নিচে জীবন্ত পুঁতে রাখা'— তাদের নিত্য-অভ্যাসে রূপ নিয়েছিলো। তারা ছিলো কট্টর

---

১. দেখুন ঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস, অধ্যায়: ৫০

মূর্তিপূজারী আর পরকাল সম্পর্কে বলতে গেলে একেবারেই বে-খবর, অজ্ঞ।

'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা যেমন অকল্পনীয় ছিলো, তাদের ধর্মীয় সংস্কারের প্রত্যাশাও ঠিক তেমনি অকল্পনীয় ছিলো। আরবদের ধর্মের ভিত্তিমূলে ছিলো শুধু প্রতিমা ও পুতুলপূজা। মূর্তিপূজার প্রতি অতি-আসক্ত আরব জাতির সংশোধনকল্পে শত শত বছর ধরে মিসরীয় ও সিরীয় খৃস্টবাদীদের পক্ষ থেকে চেষ্টা ও তৎপরতা অব্যাহত ছিলো বটে কিন্তু ঠিক সমান তালেই তাদের ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতাও ছিলো অব্যাহত।'

এ-স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন স্যার ইউলিয়াম মূরের ন্যায় বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ।[১]

কারো জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়াকে তারা চারিত্রিক কোনো অপরাধই মনে করতো না। ঠাণ্ডা মাথার খুন করা আর ভুলবশতঃ খুন— এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে বলে তাদের আচরণে বোঝা যেতো না। হত্যার প্রতিশোধ না-নেয়া এবং জিঘাংসা না-থাকা— তাদের কাছে বিবেচিত হতো চরম অপমানের বিষয়রূপে। প্রবৃত্তির দাসত্ব, চরিত্রহীনতা ও অপবিত্রতার বাজার ছিলো রমরমা। অপরের সম্পদের হিফাযত, ওফাদারি—বিশ্বাস রক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতির কোনো মূল্য ছিলো না আরব জাহেলিয়াতে।'

এ-সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে ইসলামের এক বিখ্যাত দুশমনও, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ ভদ্রলোক মারগুলিয়াস নামে দুনিয়ার কাছে পরিচিত।[২]

'মক্কার ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে স্বার্থপরতা ও সুদখোরী ছিলো একেবারে খোলামেলা। পুরুষের অবসর-বিনোদনের জন্যে ছিলো যুবতী নারী। ছিলো মদ-জুয়া। 'জোর যার রাজ্য তার' আইন ছিলো 'পূর্ণ কার্যকর'। বিধাবা নারী ও অসহায় এতিমের কোনো অধিকার সে সমাজে স্বীকৃত ছিলো না। আল্লাহ্‌র নাম সম্পর্কে মক্কাবাসী অবগতি লাভ করেছিলো ঠিকই, কিন্তু

---

১. দেখুন ঃ লাইফ অব মুহম্মদ, অধ্যায়-১২, এবং ভূমিকা।

২. মুহাম্মদ ঃ সাওয়ানেহে মাশাহীরে আকওয়াম সিরিজ, অধ্যায়-১।

বাস্তব জীবনে তার বিন্দুমাত্র রেখাপাতও পরিলক্ষিত হয় নি। তাই 'খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা অর্থ তাদের কাছে হাকিম, মালিক ও শাসনকর্তারূপে পরিগণিত ছিলো না। নিজেদের লাভ-ক্ষতির এবং গোত্রীয় রস্ম-রেওয়াজ পালনের জন্যে সৃষ্টিলোকের সবকিছুর সামনেই তারা মাথা ঠেকাতো।'

এই বিশ্লেষণ যিনি করেছেন, তিনি হলেন নেদারল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজের প্রসিদ্ধ প্রভাষক হারগ্রেবেচ, যাকে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে উক্ত বিষয়ের উপর বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্যে নিয়োজিত করা হয়েছিলো।[১]

আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী এক প্রগতিবাদী মুসলিম মনীষীর মুখ থেকেও উপরোক্ত বর্ণনার সারমর্ম শোনে নেয়া যাক, যিনি স্বজাতির চিন্তা-চেতনা এবং মন ও মননকে প্রগতির দিগন্তে পৌঁছে দেয়ার জন্যেই রচনা করেছেন 'সীরাতে মুহাম্মদী' সংক্রান্ত এক বিশাল গ্রন্থ। তিনি লিখেন—

'নির্জীব নিষ্প্রাণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো সৃষ্টির সেরা জীব— মানুষকে। পিতার রেখে-যাওয়া স্ত্রীকে উত্তরাধিকার হিসেবে ভোগ করতো পুত্ররা। একাধিক সহোদরাকে একসঙ্গে বিবাহ করা ছিলো বৈধ। বহুবিবাহের কোনো সীমা-সরহদ নির্ধারিত ছিলো না। মদ, জুয়া ও ব্যভিচার চলতো— অবাধে। নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা এমন আকার ধারণ করেছিলো যে, আরবের সবচে' নামকরা কবি নিজের এক কবিতায় বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছে আপন ফুপাতো বোনের সঙ্গে ব্যভিচারের কাহিনী, অতঃপর তা ক'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে প্রকাশ্য দিবালোকে সাহিত্য-চ্যালেঞ্জরূপে। যুদ্ধ-বিগ্রহে জীবিত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা, নারীর পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলা এবং নিষ্পাপ শিশুদেরকে তরবারির ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত করা— সবই ছিলো তাদের কাছে স্ফূর্তির ব্যাপার।[২]

যখন এলেন আল্লাহ্‌র রাসূল

এ-পাপে ভরা দুনিয়ায় তখন চোখ মেলে তাকান এক অসহায় এতিম নবজাতক। আল্লাহ্ চাইলেন, এ-অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁকে বড় করবেন। বিশেষ কোনো গোত্র ও সম্প্রদায়ের নয়, বিশেষ

---

১. মোহামেডানিজ্‌ম, প্রথম অধ্যায়।

২. সীরাতুন্নবী, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃঃ।

কোনো জাতির নয়, বিশেষ কোনো ভৌগলিক সীমার নয়, সারা জগতের বরং জগতসমূহের সংস্কার ও সংশোধনের মহান দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

'যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্যে 'সতর্ককারী' হন।' -ফুরকান: ১
সবার কাছে আল্লাহ এ-পয়গাম দিয়ে তাঁকে পাঠাবেন, যারা বিদ্রোহ করে স্রষ্টার বিরুদ্ধে— কী হবে তাদের শেষ পরিণতি।

* * *

মক্কার সে এতিমই এখন পয়গাম্বর। প্রচার করতে লাগলেন তাঁর পয়গাম। তখন তাঁর আশ্-পাশের সমস্ত তাগুতি শক্তি একজোট হয়ে চরম শত্রুতা ও বিরোধিতায় মেতে ওঠে। সহনশীল নবী নীরবে সয়ে যান সব ধরনের অপমান লাঞ্ছনা ও জুলুম-নিপীড়ন। ফলে আরো বেড়ে যায় শত্রুর সাহস। তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে এ-দাবি উঠতে থাকে 'যদি বাস্তবিকই সে নবী হয়ে থাকে তাহলে মু'জিযা কোথায়? কেনো তাঁর উপর মু'জিযা নাযিল হচ্ছে না?
মুহাম্মদী কাফেলার পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয়, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী 'ফুরকান' তো প্রথম থেকেই তাঁর সহযোগী!

قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

'নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহি থেকে .. সুবুদ্ধি ভ্রান্তি থেকে পৃথক হয়ে গেছে।' -বাকারা: ১৫৬

হক ও বাতিলের পথ তো প্রথম থেকেই পৃথক হয়ে আছে! কিন্তু হে দৃষ্টিহীনরা! পার্থিব স্বার্থ ও ধন-দৌলত ছাড়া অন্য কোনো 'ফুরকান'-এর উপস্থিতি উপলব্ধি করতেই তো তোমরা অক্ষম, অযোগ্য? তারপরও কেনো তোমরা এ-সব বালক-সুলভ প্রশ্নের অবতারণা করে যাচ্ছো? 'এই পয়গাম্বর তো দেখি বিলকুল আমাদেরই মতো? কেমন খায়-দায়, আবার দেখি হাটে-বাজারেও ঘুরে বেড়ায়! মানব শক্তির উর্দ্ধের কোনো ফেরেশতা কেনো তাঁর সাহায্যে অবতারিত হচ্ছে না? কিংবা তাঁকে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত করতে এবং আরাম-আয়েশে জীবন কাটাতে তাঁর কাছে আসমানী

ধন-ভাণ্ডার কেনো অবতারিত হচ্ছে না? কিংবা জান্নাতের প্রতিশ্রুত এবং কাল্পনিক উদ্যানের মতো কোনো উদ্যান কেনো তাঁকে দেয়া হচ্ছে না?

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا.

'এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কেনো কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না, যে তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকতো? অথবা তার কাছে কেনো ধন-ভাণ্ডার ঢেলে দেয়া হয় না অথবা তার এমন একটি বাগান হয় না কেনো, যা থেকে সে আহার যোগাতে পারতো?' -ফুরকান: ৭

তবে এসো; শোনো তোমাদের এ-সব অযৌক্তিক, নিরর্থক ও অন্তসারশূন্য প্রশ্নের জওয়াব— এই পৃথিবীতে 'ফুরকান'-এর অবতারণ অবশ্যম্ভাবী। এমন 'ফুরকান', যা তোমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারাই তোমরা অনুভব করতে পারবে! একটি অদৃশ্য শক্তি হিসাবে তোমরা ফেরেশতাদের অবতারণের কথা বলছো! এ-রাসূলের মর্যাদা তো তাদের চেয়ে অনেক মহান! এই নবী'র সাহাবী ও শাগরিদদের উপরই তো এমন সব অদৃশ্য সাহায্যের অবতারণা ঘটবে, যার ব্যাখা প্রদান ও রহস্য উদ্ঘাটনে তোমাদের নামকরা দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত সবিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করবে!

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ.

'পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' (ফায়সালার গ্রন্থ) নাযিল করেছেন।' -ফুরকান: ১

আশ্চর্য! আজ তোমরা একটি উদ্যান-প্রাপ্তিকে 'চরম পাওয়া' মনে করছো! অদূর ভবিষ্যতে 'চোখভরে' দেখে নেবে— এই নবীর উম্মতরাই 'কায়সার' ও 'কিসরা'-র সিংহাসন তছনছ করে দেবে! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এদের হাতে রোম ও পারস্যের প্রতাপশালী পরাশক্তিদ্বয়! মিসর, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও হিন্দুস্তানের সবুজ শ্যামল উদ্যান ও কুসুম কানন এদেরই পায়ের নিচে হবে দলিত মথিত!

অবিরাম বরকত নাযিলকারী কতো মহান সেই সত্তা, নীলাকাশের বুকে গেঁথে দিয়েছেন যিনি বে-শুমার সিতারা! স্থাপন করেছেন দীপ্তিমান রবি, স্নিগ্ধ আলো বিকিরণকারী শশী!

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا.

'কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও আলোকোজ্জ্বল চন্দ্র।' -ফুরকান: ৬১

যে মহান প্রতিপালক সৃষ্টিলোকের বাহ্যিক দিক-নির্দেশনা ও আলোর জন্যে গ্রহণ করেছেন সকল ব্যবস্থা, কী করে তিনি স্বীয় বান্দাগণকে রূহানী আলো ও দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন?

সূর্য তো তখনই উদিত হয় যখন শেষ রজনীর অন্ধকার .. সুবহি সাদিকের সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে!! অনুরূপ পৃথিবীতে রূহানী অন্ধকার এখন সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করে গেছে! তাই সেই উজ্জ্বল দীপ্তিমান সূর্য উদয়নের সময় এখন সন্নিকট, যার আলোয় আলোকিত হবে তামাম বিশ্ব জাহান। সূর্য যখন উদিত হয়, তখন তার আলো গ্রহণ করে চাঁদও ঝলমল করে হেসে ওঠে। আলোকিত হয় নিজে। আলোকিত করে অন্য সবকিছুকে। ঐ রূহানী সূর্যের কিরণও স্বাভাবিকভাবেই হবে এমন শক্তিশালী, যা অপরকে আলোকিত করে চাঁদের মতো করে তুলবে আলোকোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। কুদরতের সাধারণ ও বাহ্যিক নিয়ম হলো দিন ও রাত আসবে— একে অপরের পেছনে, পর্যায়ক্রমে।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.

'যিনি দিবস-রজনীকে করেছেন পর্যায়ক্রমিক— তাদের জন্যে যারা চায় উপদেশ লাভ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে।' -ফুরকান: ৬২

যারা অনুসন্ধিৎসা-প্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রয়াসী তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন ক্রম আবর্তনশীলরূপে। সুতরাং যাদের হৃদয়ে নসীহত কবুল করার এবং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে এ-বাহ্যিক নিদর্শনই যথেষ্ট। পার্থিব জগতে রাতের পর দিন আসা যখন অপরিহার্য,

তখন রূহ ও আত্মার জগত চিরকালই কি অন্ধকারে ছেয়ে থাকবে? প্রবৃত্তি পূজা, ও আল্লাহ-বিস্মৃতির দীর্ঘ অমানিশার অবসান ঘটা এবং সুপ্রভাতের কোমল কিরণে পৃথিবীর ঝলমলিয়ে ওঠা কি তাহলে এখন অনিবার্য নয়?

সুতরাং অবসান ঘটলো সে দীর্ঘ রজনীর। উদিত হলো রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল রবি। পরিশোধন ও সঠিক দিক-নির্দেশনার সোনালী সূর্য। আগমন ঘটলো এক জীবন্ত 'ফুরকান'-এর। সেই জীবন্ত 'ফুরকান'-এর মহান কীর্তি চোখ মেলে তোমরা আজ দেখে নাও!

দেখতে দেখতে ক্ষণকালের মধ্যে তোমাদের চোখের সামনে নৈতিক বিপর্যয় ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের কী ইনকিলাব ও বিপ্লব সৃষ্টি করে দিলেন তিনি! তোমরা তাঁর পয়গাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের যুক্তির অবতারণা করে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাচ্ছো। একেবারে রহমানের অস্তিত্বের ব্যাপারেই সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলছো জিজ্ঞাসা করছো— রহমান আবার কে? নির্লজ্জতা ও গোস্তাখির একটা সীমা থাকা উচিত! তাহলে এবার দেখো সেই না-দেখা রহমানের রহমতের বারিপাত! অবলোকন করো রহমানিয়াতের বরকতময় ফল্গুধারা! চাষাবাদের অনুপযোগী তোমাদের এ-অনুর্বর ঊষর ভূ-খণ্ড থেকে, তোমাদের নির্জীব কওম থেকে, তোমাদেরই আশ্-পাশ থেকে জন্ম নিচ্ছে রহমানের কেমন সব বান্দা, যারা মানুষের সাথে অহেতুক সংঘাতে লিপ্ত হয় না।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا.

'রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলে তখন তারা বলে সালাম—শান্তি।'

-ফুরকান: ৬৩

না, কথায় কথায় তারা অকারণে উত্তেজিত হয় না। কুপ্রথাময় জীবনের সেই কু-অভ্যাস থেকে নিজেদেরকে চিরমুক্ত করে এমন বিনয়ী ও শালীন হয়ে গেছে তারা, হাত পা'র বাড়াবাড়ি এবং কারো উদ্দেশ্যে কোনো রকম শক্ত কথা বলা এখন তাদের পক্ষে অকল্পনীয়। তাদের চাল-চলন আজ তাদের বিনয় ও সহনশীলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অপরকে তারা উত্তেজিত

করবে কি? অজ্ঞরা যখন দুষ্ট ও কুমতলব নিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করতে আসে এবং তাদের হৃদয়কে ব্যথিত করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের দুর্নাম ও অভিযোগ উত্থাপন করে, তখন এ-সবের বদলায় তাদের ধৈর্যের বিস্তীর্ণ ললাটে সামান্যতম ভাঁজও পড়ে না। তারা বরং সহনশীলতা, প্রেম-ভালোবাসা এবং আপোষ-মিমাংসার লক্ষ্যে বিনয়-নম্র ভাষায় তাদের কাছ থেকে নিজেদের সালামতি ও মুক্তি চেয়ে কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে সালামতি ও নিরাপত্তার দু'আ দিয়ে পাশ কেটে চলে যায়।

কিন্তু এমনটি তারা ক্ষণ-পূর্বেও ছিলো না। এই কিছুদিন আগেও তো এই লোকগুলোর কতো বিনিদ্র রজনী কেটেছে মদের আড্ডায় ও নৃত্য-গীতের মাতাল আসরে? অশ্লীলতায় ডুবে থেকে তারা কাভার করে দিয়েছে রাতকে রাত! তারাই আজ রহমান এর-বান্দা। আজো তাদের বিনিদ্র রজনী কাটে বটে, কিন্তু তা কাটে ঐশী-প্রেমের ইবাদত বন্দেগীতে, দু'আ ও তিলাওয়াতে— অন্য কিছুতে নয়।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.

'এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্য সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।' -ফুরকান: ৬৪

তাদের রাত্রিগুলো এখন আর মদের আড্ডা ও নাচগানের আসরের কাছে নয়— তাহাজ্জুদের রুকু সিজদার কাছে দায়বদ্ধ। কারো ভয়ে কিংবা চাপে পড়ে, কারো সম্মানার্থে কিংবা লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে তারা এ সব করছে না। বরং 'প্রত্যেক কর্মেরই ফলাফল ভোগ করতে হবে' এই চিরন্তন বিধানের মর্মকথা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে বলে। পরকালের শাস্তি র ভয়াবহ ছবি তাদের চোখের সামনে সদা ভাসে বলে। প্রত্যেক খারাপ কাজের খারাপ পরিণামের মুখোমুখি হওয়ার ভয় তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

'এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই তার শাস্তি বিনাশ। বসবাস ও আবাসস্থল হিসাবে তা কতো নিকৃষ্ট।' -ফুরকান: ৬৫-৬৬

সর্বশেষ শাস্তির জায়গা জাহান্নামের কথা ক্ষণিকের জন্যেও তারা ভুলতে পারে না। এ জন্যে তারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিনয়ের সঙ্গে পালনকর্তার দরবারে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তির জন্যে মুনাজাত করতে থাকে। সুতরাং যাদের উপর এই পরিমাণ আল্লাহভীতি প্রভাব বিস্তার করবে, অনিবার্যভাবেই তারা জীবনের প্রতিটি অংশে রূপায়িত করবে— ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা। তাই এরা শুধু 'হুকুকুল্লাহ' বা আল্লাহ্র হক আদায় করার জন্যেই সদা ব্যগ্র ও উন্মুখ নয়, বরং বান্দার হক আদায় করার ব্যাপারেও তারা সদা তৎপর ও উৎসাহী। তাই যখনই খরচ করার পালা আসে তখন তারা গোনাহর কাজে খরচ করে না। বিলাসিতা ও মদ্য পানেও তাদের পয়সা নষ্ট হয় না। সুনাম-সুখ্যাতি হাসিলের জন্যেও তাদের থলের মুখ খোলে না। পক্ষান্তরে যখন আসে সৎকর্মে খরচ করার পালা .. যখন গরিব-মিসকিন ও অসহায়-অনাথদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তারাই আত্মপ্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ দানবীর হিসাবে। এ ব্যাপারে অপব্যয় কিংবা কৃপণতা নয়, মাঝামাঝি পন্থাই তাদের লক্ষ্য—পছন্দ।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.

'এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী'। -ফুরকান: ৬৭

মানুষ কেনো 'কবীরা গোনাহে' লিপ্ত হয়, তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তিনটি জিনিস চিহ্নিত করেছেন ঃ

১. 'মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত সে-সব চিন্তা ভাবনা, যা মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।'
২. 'মানুষের ক্রোধ-প্রবণতা'।
৩. 'মানুষের কামশক্তি'।

এই তিনটির অনিবার্য পরিণাম হিসাবেই শিরকের প্রকাশ ঘটে। ছড়িয়ে পড়ে খুন-খারাবি ও ব্যভিচার।

সাম্প্রাতিক কালের গবেষণায়ও মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনটি জিনিসকে।

১. 'মানুষের বিবেক-বুদ্ধি'।

২. 'মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা'।

৩. 'মানুষের আবেগ-অনুভূতি'।

এই তিনটি জিনিসে অবক্ষয় দেখা দিলেই উপরোক্ত তিনটি মারাত্মক গোনাহর শিকার হয়ে পড়ে মানুষ। অর্থাৎ সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিণাম হলো 'শিরক'। আর মানুষের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যখন বল্গাহারা ও বে-কাবু হয়ে যায়, তখনই মানুষ মানুষকে 'খুন' করে। এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। আর মানুষ যখন নিজের আবেগ-অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, তখন সে লিপ্ত হয় ব্যভিচারে-পাপাচারে। মানব জাতি যখন যেখানেই ধ্বংস হয়েছে এ-সব মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তখনকার আরব জাহেলিয়াত বিশেষভাবে এ-সব মারাত্মক গোনাহেই লিপ্ত ছিলো। যেমনটি নিমগ্ন হয়েছে বর্তমান পশ্চিমা দুনিয়ার সভ্য নামধারী ফিরিংগিরা।

মু'জিযা না ইনকিলাব

জীবন্ত 'ফুরকান'-এর মু'জিযা ছিলো এই যে, বর্বরতার সংক্রামক ও বিষাক্ত পরিবেশে নিজের শাগরিদদেরকে বর্বরতার সংক্রমণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন তিনি। ফলে সেই মানবতা-কলুষ-করা পরিস্থিতিতেও তারা এমন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন যে তাদের ভিতর যাবতীয় সৎ গুণাবলীর বিপুল সমাবেশ ঘটেছিলো। আল্লাহ্‌র সাথে তারা এখন অন্য কোনো ইলাহ ও মা'বুদকে ডাকে না। সঙ্গত ও বৈধ কারণ ব্যতীত জিঘাংসাবৃত্তিতে কাউকে হত্যাও করে না। ব্যভিচারের ধারে কাছেও যায় না। তারা বিশ্বাস করে, 'খারাপ ও মন্দ কাজের পরিণাম থেকে কেউ-ই রেহাই পাবে না'। তবে যারা খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করে এবং সৎ পথে চলতে শুরু করে, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তাদেরকে কোনোক্রমেই শাস্তি দেবেন না। বরং তিনি ভালো কাজের বিনিময়ে তাদের অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। এটাই তাঁর আইন। এটাই তাঁর বিধান। কেননা যে কেউ-ই অপরাধকে অপরাধ ভেবে তা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সৎকর্মে নিবেদিত হয়ে যায়, তখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে শয়তানের সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছে এবং বাঁকা পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছে সঠিক সরল সোজা পথ।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

'এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য 'ইলাহ'-এর ইবাদত করে না। আল্লাহ যে প্রাণের হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দিগুণ হবে এবং সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গোনাহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে আল্লাহ্‌র দিকেই পরিপূর্ণরূপে ফিরে আসে'। -ফুরকান: ৬৮-৭১

মিথ্যা ও নিরর্থক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি

কিছুদিন আগেও তাদের জীবন মিথ্যা, অন্যায়, অসত্য, আত্মপ্রচার, রিয়া, প্রতারণা ও ঠকামির আঁচলে বাঁধা ছিলো। কিন্তু আজ দেখতে দেখতেই এরা পূতঃপবিত্র হয়ে এমন সোনালী জীবনের অধিকারী হয়ে গেলো যে, আজ তাদের পক্ষে মিথ্যা বলা, কোনো মিথ্যা কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা ও শরীক হওয়া তো দূরের কথা, যারা মিথ্যাবাদী, তাদের সঙ্গটুকু পর্যন্ত আজ তারা এড়িয়ে চলে। তাদের উপস্থিতিতে অসম্ভব আজ মিথ্যা ও প্রতারণা। ঘটনাক্রমে কখনো যদি তারা এমন কোনো মজলিসে আটকা পড়ে যায়, যেখানে চলে মিথ্যা, প্রতারণা ও অসত্যের জয়গান, তখন সে মজলিসের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলো তাদের মধ্যে কোনো রকমের প্রভাবই ফেলতে পারে না। কেবল তাই নয়, তাদের সংযমী মনোভাব ও মহান চরিত্র দৃষ্টে সে মজলিসের উদ্যোক্তারাই দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرامًا.

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে চলে যায়।' -ফুরকান: ৭২

সে সময় চলে গেছে তখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও বড়ত্বের কথা বিবৃত হতো আর তারা বধির ও অন্ধ বনে সেগুলো থেকে উদাসীন ও বে-খবর হয়ে থাকতো। এখন তাদের কান খুলে গেছে। তাদের দৃষ্টি আজ স্বচ্ছ—দিবালোকে ভাস্বর! পৃথিবী এখন তাদের দৃষ্টিতে কোনো রঙমহল ও নাট্যশালা নয়— দারুল আমল—পরকালের ফসল ও পাথেয় সংগ্রহের কৃষিক্ষেত্র। আজ তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে ভালো-মন্দের নীতি। কাজ ও কাজের বিনিময়। রাহমান-রাহীম-প্রদর্শিত সঠিক সরল সোজা পথ এখন তাদের সামনে আলো ছড়াচ্ছে।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

'এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না'। -ফুরকান: ৭৩

তাদের জীবন এখন স্বচ্ছ-নির্মল—পূতঃপবিত্র। কিন্তু এতোটুকু প্রাপ্তিই তাদের কাছে প্রাপ্তি নয়। বরং এ-প্রাপ্তির আলোকময় পথ ধরে খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের হৃদয়ে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্লাবন এসেছে। কিসের এ জোয়ার? কিসের এ প্লাবন? মুনাজাত ও প্রার্থনার! আল্লাহ্‌র সকাশে সকাতর মিনতির! আরশ-দোলানো ভাষায়—

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

'এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চোখ-জুড়ানো করে দেন, আর আমাদের করুন মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ ও পুরোধা।' -ফুরকান: ৭৪

তাদের নিকটাত্মীয় ও স্ত্রী পুত্ররাও তাদের জন্য হোক দৃষ্টি নন্দন। তারাও রঙিন হোক তাদের রঙে। তাদের জীবনও গড়ে উঠুক তাদের নমুনা ও আদর্শের উপর! যারা এখনো সত্যের ছোঁয়া পায় নি, তাদের সত্য পথের

দিশা দেবার প্রবল বাসনা ও অদম্য আগ্রহ এদের এতো অস্থির ও বে-কারার করে দিয়েছে যে, নিজেদের সংযম-সংশোধন-পরিশুদ্ধির উপরই কেবল তারা সন্তুষ্ট নয়, অন্যান্য মু'মিন-মুত্তাকি ভাইয়ের জন্যও তারা নিজেদেরকে নুমনা ও আদর্শরূপে পেশ করতে চায়!

আল্লাহু আকবার! পূর্ণতা ও আত্মার উন্নতি তাদের কাছে এই নয় যে, তারা নিজেরা ভালো হয়ে গেছে! এও নয় যে, ভালো মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে! বরং সারাক্ষণ তারা লালায়িত ও ব্যাকুল— কী করে অন্য সব ভালো ও খাঁটি মানুষের ইমামতি ও নেতৃত্ব তাদের অর্জিত হয়ে যায়! সব মুত্তাকি মিলে তাদেরকে গ্রহণ করবে রাহবার—রাহনুমা ও অনুসরণীয় হিসাবে! আর জীবন যাদের অনুসরণীয় হয়, অন্য সব পূর্ণতরদের জন্যে, কামিল মুত্তাকিদের জন্য হয় আদর্শ নমুনা, তাদের পূর্ণত্বের সীমানা এবং তাদের আত্মোন্নতির উচ্চতা কেউ কি নিরূপণ করতে সক্ষম হবে? পূর্ণতার কোন্ স্তরে হতে পারে তাদের অবস্থান?

শীত ও বসন্ত

জমিন শুস্ক হয়। পিপাসার্ত হয়। বারিবর্ষণে বিরান ও নির্জীব বাগান ভরে ওঠে সবুজ-শ্যামলিমায়। মৃদু সমীরণের তালে তালে আন্দোলিত হয় ঘুমিয়ে-থাকা লতাগুল্ম ও শস্য-তরুলতা। লকলকিয়ে ওঠে ওরা সব— নতুন জীবনের ছোঁয়া পেয়ে।

বাগান পড়ে থাকে উজাড় হয়ে। শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে যায় সব পাতা। কিন্তু বসন্তের বায়ু-প্রবাহ শুরু হতেই নতুন করে আবার গজাতে থাকে কচি কচি কিশলয়। নির্জীব ও উজাড় বাগান জুড়ে পরিদৃষ্ট হয় তখন দৃষ্টিকাড়া সবুজের মেলা!

সারা পৃথিবী ঢাকা পড়ে আছে অন্ধকারের চাদরে। সবকিছুই আঁধারে নিমজ্জিত। এরই মধ্যে উদিত হলো আরেক পূর্বাকাশে আরেক ঊষা! সাথে সাথে চারদিক আলো-ঝলমল হয়ে ওঠে। সংস্কার ও সংশোধনের মহান ব্রত নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন একজন পবিত্র আত্মার মানুষ! আপন সান্নিধ্যের পরশে কতো অন্ধকে তিনি দান করলেন আরোগ্য! কতো মৃত মানুষের মধ্যে সঞ্চার করলেন জীবন-স্পন্দন! কুদরতি কারখানায় এই নিয়মের নজির বারবারই মানুষের বিবেকের পর্দায় দোল দিয়ে যায়!

মৃতপুরীতে জীবনের ছোঁয়া

কিন্তু পৃথিবীতে এ-ধরনের রূহানী ইনকিলাব সৃষ্টি করা কি সহজ ব্যাপার? কিছুদিন আগেও যারা ছিলো রাহাযানি ও খুন-খারাবিতে লিপ্ত, আজ তাঁরা শুধু নিজেরাই সঠিক পথের দিশা পেলেন না, সঠিক পথের সর্বোত্তম দিশারী ও রাহবার হিসাবেও বিবেচিত হলেন। নিকট অতীতেও যাঁদের জীবন আবদ্ধ ছিলো অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নিপীড়ন ও সকল প্রকার অনাচারের কাছে। তাঁরাই আজ এমন উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী হলেন যে, খোদ সততা ও পবিত্রতাই তাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত হতে পেরে গর্ব ও গৌরব বোধ করে। কয়েকদিন আগেও যাঁরা ছিলেন মৃত, তাঁরা আজ কেবল জীবিতই নন, বরং অন্যের মাঝেও জীবন সঞ্চারের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এমন সূর্যের উদয়ন, যা সব কিছুকে সূর্যের মতোই দীপ্তিমান করে দেয়। এমন 'মসীহ' (জীয়ন-কাঠির স্পর্শে মৃতের ত্রাণকর্তা)-এর অবতরণ, যে মৃতকে পর্যন্ত 'মসীহা' বানিয়ে দেয়!

রাসূলে আরাবী ছাড়া, পুণ্যাত্মা সাহাবীগণ ছাড়া, তাঁর শাগরিদ ও অনুগত গোলামদের ছাড়া ইতিহাসের পাতায় এর দ্বিতীয় কোনো নজির পাওয়া যাবে কি? অজ্ঞজনেরা বলে শেষ নবী নাকি কোনো মু'জিযা দেখিয়ে যান নি। অথচ তাঁর পবিত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ছিলো একটি জীবন্ত ও চলমান মু'জিযা। তাঁর জীবনের কোনো অংশ কি এমন ছিলো, যা মু'জিযার রঙে রঙিন ছিলো না? এই 'জীবন্ত মু'জিযা'-র বিদ্যমানতায়— নূহ-এর ত্রাণ-কিশতী, ইবরাহীম খলীল-এর অগ্নিশিখার ফুল বাগান, মুসা নবীর যাদু বিধ্বংসী 'আসা' (লাঠি), সুলায়মান-এর ভ্রাম্যমান সিংহাসন, ইউসুফ-এর অনুপম সৌন্দর্য, ঈসা-এর কুষ্ঠ-অন্ধত্ব-বিনাশী ফু এবং অন্য কোনো সীমিত, সাময়িক ও বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ মু'জিযার কি আর প্রয়োজন থাকতে পারে?

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে না তখন ছিলো কোনো অস্পষ্টতা ও রহস্য, না এখন। আবু লাহাব, আবু জেহেল এবং তাদের সমস্ত শিষ্য-চেলারা তখন দেখেছিলো দুর্গন্ধযুক্ত খাদ— গামলায় পড়লো আর তাদের চোখের সামনেই তা সদ্য প্রস্ফূটিত সুরভিত গোলাপে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এলো!

হকের শক্তি সব ধরনের বাতিলের মুকাবিলা এবং বিপদের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে বে-পরোয়া। চিরঞ্জীব মা'বুদের জীবন্ত রাসূলের জীবন্ত মু'জিযার জওয়াব— না কেউ তখন পেশ করতে পেরেছিলো, না আজ সত্যকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী মুহাম্মদের দুশমনদের এবং আবু লাহাব ও আবু জেহেলের বর্তমান উত্তরসূরীদের পক্ষে সম্ভব হবে।

আকবর এলাহাবাদির মরতবা আল্লাহ্ বুলন্দ করুন। নবীজীর প্রশংসায় রচিত তাঁর সমস্ত নাতের সুগন্ধি তিনি জমা করে দিয়েছেন যেনো তাঁর এই কাব্য পংক্তিতে—

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ھادي بن گئے
کیا نظر تھی جسنے مردوں کو مسیحا کر دیا

'নিজেরাই যাঁরা ছিলেন পথহারা, তাঁরাই হয়ে গেলেন অন্যদের পথ প্রদর্শক!
কোন্ সে দৃষ্টি দিয়ে তিনি মৃতদেরও মাসীহা[১] বানিয়ে দিলেন?!'

---

১. মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চারের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

এতিমের রাজত্ব

সভ্যতার লীলাভূমি থেকে বহুদূরে

সূদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের চেয়ে কিছু কম সময় এ রূপ অতিবাহিত হলো যে, সে সময় সভ্যতার লীলাভূমি থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত একটি বিরান, নির্জীব ও চাকচিক্যহীন শহরে, আগুন ঝরানো আসমানের নিচে, শুষ্ক ও পাথুরে জমিনের বুকে এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত কিন্তু নিরক্ষর ও নির্ধন পরিবারে এক নবজাতক চোখ মেলে তাকালেন— এই ধুলিধূসর প্রকৃতির কোলে।

দাবির স্বপক্ষে যুক্তি কেবল 'আল্লাহ্ সহায়'

জন্মের আগেই যার পিতৃস্নেহের শ্যামল ছায়া মিলিয়ে যায় চিরতরে। জন্মের অব্যবহিত পর স্নেহময়ী মাও চলে গেলেন আখেরাতের অনন্ত সফরে। এভাবেই অদৃশ্য হয়ে যায় লালন-পালনের বাহ্যিক কুদরতি মাধ্যমটুকুও। এগিয়ে আসেন দাদা। টেনে নেন তাঁকে লালন-পালনের স্নেহভরা বুকে। কিন্তু শৈশব না পেরুতেই তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন অনন্ত কালের ঘুমে!

গৃহের সর্বত্র বিরাজ করছে শূন্যতা। নেই অর্থকড়ি .. নেই বেঁচে থাকার সামান্য উপকরণ। না আছে রাজত্ব, না আছে নেতৃত্ব। এই শূন্যতার সিঁড়ি বেয়ে অপর দিকে তাকালে দেখা যাবে— না আছেন বাবা, না আছেন দাদা, না আছেন দাদী। নেই ভাই, নেই বোনও। একেবারে একাকী। উপায়-উপকরণহীন! সহায়-সম্বলহীন! আল্লাহ্র এক ক্ষুদে বান্দা। যাঁর একমাত্র সহায় দৃষ্টির অন্তরালের সেই মাওলা! অদৃশ্য লোকের সেই মহান মালিকের কাছেই তাঁর সকল চাওয়া পাওয়া, সকল আকুতি!!

আরবদের অবস্থা

'শিরক'-এর ঘনঘটায় ছেয়ে গেছে সারা দেশ। জাতি ডুবে আছে জড়বস্তু ও প্রতিমা-পূজায়। ডুবে আছে অবিচার-ব্যভিচারে। মানবিক সহানুভূতির সাথে তাদের কোনো পরিচয় নেই। অন্যায় অপরাধের সব ধরন ও প্রকরণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তাদের জীবনের সবকিছু। কথায় কথায় ঝলসে ওঠে

তরবারি। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে চলতে থাকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এতিমের অধিকার হরণ, গরীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, চারিত্রিক অবক্ষয় এবং আত্মিক ব্যাধি ঘিরে আছে তাদের জীবন। আরব জাতির সীমিত ভূ-খণ্ডের ভিতরে এই হলো সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির অবস্থা।

দুনিয়ার দৃশ্যপট

অন্যসব প্রতিবেশী সম্প্রদায় ও জাতিও চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছিলো। পাক-পবিত্রতার কোনো মানদণ্ডেই তাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। মিসর, ইরান, চীন এবং হিন্দুস্তান ছিলো তৎকালীন তাহযিব-তামাদ্দুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি ও প্রাণ-কেন্দ্র। কিন্তু সেকালে সব দেশই চরিত্রহীনতা ও নৈতিক বিপর্যয়ের আখড়ায় পরিণত হয়েছিলো। তাওহিদ ও আল্লাহ্‌র দাসত্ব হলো সমস্ত চারিত্রিক উৎকর্ষের মূল ভিত্তি। কিন্তু তাদের মধ্যে সেটিরই ছিলো দারুণ অভাব। তাদের হৃদয় ছিলো সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে একেবারে শূন্য। হাতে গড়া হাজারো দেব-দেবী ও প্রতিমা-পূজা তাদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়েছিলো শিকড় বিছিয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও সংস্কারসেবী ও সংশোধনকারীদেরও আবির্ভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য সয়লাবের মুখে কারো কদম কি সহজে টিকে থাকতে পারে?

পবিত্রতার উদয়ন

দেশের বরং সাড়া পৃথিবীর এই প্রতিকূল পরিবেশের প্রবল স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে যান এ-অল্প বয়সী এতিম। সবার সামনে মেলে ধরেন তাঁর পবিত্র জীবনের পৃষ্ঠাগুলো— একে একে। স্বীয় জীবনের এক পরিপূর্ণ আদর্শ পৃথিবীর সামনে পেশ করে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি। বুক বাঁধলেন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে। তাঁর আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে সবাইকে। তাঁর হাতে নেই সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ। সব দিক থেকেই তিনি সহায়-সম্বলহীন। কোথাও কোনো দখল নেই তাঁর ইচ্ছার। অপরদিকে জাতীয় সংস্কার ও পরিশুদ্ধির চিন্তায় বিভোর তাঁর দেহ-মন-চিন্তা। বরং বলা উচিত সারা পৃথিবীর মঙ্গল-চিন্তায় সামনে অগ্রসর হওয়ার এক দৃঢ়সংকল্পে তিনি অনড়। তবে 'জাতীয় সংস্কার ও সংশোধন'

সাম্প্রতিক কালের প্রচলিত অর্থে নয়। এ জন্যে কোনো আঞ্জুমান ও সংগঠনের ভিত্তি স্থাপিত হলো না। কোনো কমিটির জন্যে কোনো ফাণ্ড খোলারও ব্যবস্থা হলো না। প্রয়োজন হলো না কোনো দল বা জোটেরও, বরং সর্বশক্তি ব্যয় করে নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেন তিনি সর্বক্ষণ।

সুকুমারবৃত্তির আধার এ-নবীন আপন চরিত্র-মাধুর্য নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন সুন্দর ও পূর্ণতরের মূর্ত প্রতীক হয়ে। তাঁর ধমনীতেও প্রবহমান যৌবনের উষ্ণ শোণিতধারা।

দেশে এখন ঘরে-ঘরে তুফান বইছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার। কিন্তু এ-নবীনের আনত দৃষ্টির সামনে খোদ 'লজ্জা' পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে নিবেদিত ও কুরবান হয়ে গেলো।

সর্বত্র আকণ্ঠ-সুরা-পানের আসরগুলো হয়ে উঠছে জমজমাট। সুরাপূর্ণ পাত্র-গুলো পরিবেশিত হচ্ছে। চারদিকে ঘুরছে অনবরত। কিন্তু এ-নবীনের তাকওয়ার আঁচলে সালাত আদায় করার বাসনায় ফেরেশতাকুল পর্যন্ত ব্যাকুল, উন্মুখ ও লালায়িত!!

মানুষ যুদ্ধ করছে। একে অপরের রক্তে সাঁতার কাটছে। আর এ-নবীন ব্যাকুল হয়ে খুঁজে ফিরছেন শান্তির পথ!

জাতি লুণ্ঠন ও অপহরণ-আত্মসাতে লিপ্ত, আর এ-নবীন ব্যস্ত সবার মাঝে বিতরণের কাজে।

পৃথিবী ছুটোছুটি করছে সঞ্চয়ের পথে। আর এ-নবীন প্রসারিত করে দিয়েছেন দানের মুক্ত হাত!

সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টিরই পূজা-অর্চনার অভিশাপে আক্রান্ত, আর এ-নবীনের হৃদয়-মন বিভোর হয়ে আছে সৃষ্টার পবিত্র ধ্যানে!!

আল্লাহ্‌র ইবাদত ও নির্ভেজাল তাওহিদই সংশোধনের মূলকথা

সমস্ত সংস্কারের বুনিয়াদ মাত্র একটি সংশোধন। অর্থাৎ আবদ এবং মাবুদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। এই ছিন্ন হয়ে-যাওয়া সূত্রকে পুনঃসংযোজন করা এবং শিরকের গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে তাওহিদ ও একত্ববাদের মহাসড়কে প্রবেশ করা।

এখানেও ধ্যান আছে, কিন্তু তা কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

এখানেও আছে সাধনা, জপতপ, কিন্তু একান্ত তাঁর জন্যেই।
এখানে কেবল তাঁকে ঘিরেই চলে নৈশকালিন সুখ-নিদ্রা এবং দিবাকালিন কর্মব্যস্ততা।

আর কতো দেরী!!

চাঁদ-সুরুজের প্রদক্ষিণ চলতে থাকে আপন আপন কক্ষপথে। কৈশোরের পালে হাওয়া লাগে যৌবনের। যৌবনের পিছু ধাওয়া করে প্রৌঢ়ত্ব। বড় হতে থাকে সুরক্ষিত ঝিনুকের অভ্যন্তরে মোতি আর ধাতব খনির গভীরে হীরা-জহরত-মণি-মুক্তা। পবিত্র জগতের এ এতিম মানিক উপনীত হন চল্লিশে—সুপরিণত বয়সে, সীমাহীন আত্মপ্রত্যয় ও অতুলনীয় দৃঢ়তা নিয়ে। বয়সের উন্নতির সাথে সাথে সত্য পথের দিশা পাওয়ার দুর্বার বাসনা ও ব্যাকুলতাও বাড়তে লাগলো তাঁর হৃদয়-জগতে। 'চরম পাওয়া'র ব্যাকুলতা দিন দিন বেড়েই চললো। ক্রমে ঘনিয়ে এলো সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ—শুভমুহূর্ত। জনবসতির কোলাহল মুক্ত, লোক সমাগম হতে দূরে, এক নির্জন গুহার শান্ত পরিবেশে এ-চিন্তায়ই কেটে যাচ্ছিলো রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এ-চিন্তার বিশালতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি হারিয়ে যাচ্ছিলেন এক অনন্ত লোকের নিঃসীমতায়! ...
হ্যাঁ, তখনই দুলে উঠলো অদৃশ্যলোকের পর্দা!
নেমে এলো নূরে নবুওত!
নেমে এলো শ্রেষ্ঠতম নবীর প্রথম পাঠ!
অর্পিত হলো তাঁর উপর দিশেহারা—পথহারা জাতিকে পথে ফিরিয়ে আনার মহা দায়িত্ব।

গুরু দায়িত্ব

এবার শুরু হলো কঠিন সাধনার নতুন ধাপ। একদিকে সমগ্র হিজাযের দুর্ধর্ষ শক্তি ও বাতিলের ঐক্যবল। অপরদিকে একাকী একজন মানুষ। সংস্কার ও সংশোধনের, হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা প্রদানের এক গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। একটি সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা শত শত বছরের বল্গাহারা জীবন প্রণালী থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে, দূর করতে হবে তাদের হৃদয় থেকে হাজার বছরের শেওলাধরা শক্ত প্রলেপ। এক দু'ব্যক্তি নয়,

একটি দু'টি খান্দানও নয়, একক কোনো সম্প্রদায়ও নয়, গোটা দেশকে, সমগ্র বিশ্বকে নতুন সাজে ঢেলে সাজাতে হবে। তারপর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও অঙ্গনকে বদলাতে হবে নতুন করে। নতুন আঙ্গিকে। সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে এ পয়গাম—

নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাও।

ধন-দৌলতের প্রতি আসক্তি ও অনুরক্তি পরিহার করো।

কৃপণতা ও সংকীর্ণতার কাঁটাবন থেকে বেরিয়ে এসো।

রাজত্ব লাভের তীব্র লালসা এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি হাসিলের অদম্য বাসনা ত্যাগ করো।

বর্জন করো মিথ্যা কবিত্ব, অশ্লীল নৃত্যগীত ও নিরর্থক শিল্প-সঙ্গীত।

পরিত্যাগ করো সুদ-ঘুষ-উৎকোচ।

অধিনস্ত ভৃত্যদের দিকে জুলুমের হাত আর বাড়াবে না।

কন্যা সন্তানদের আর জীবন্ত মাটিচাপা দেবে না!

নিষ্ঠুরতার লাগাম টেনে ধরো! বরং নিষ্ঠুরতাকে চিরতরে সমাহিত করো!

সর্বোপরি বর্জন করো বাতিল উপাস্যদের পূজা-অর্চনা।

ঈমান আনো এক আল্লাহ্র উপর!

তাঁর রাসূল হিসাবে আমার উপর!

এ-আওয়াজে ভারী হয়ে উঠলো তাদের কানের পর্দা। একটি সূক্ষ্ম ও কোমল আয়নার যেনো সংঘর্ষ হলো একটি মজবুত ও শক্ত পাথর খণ্ডের সাথে! সমস্ত বাতিল ও শয়তানি শক্তি একজোট হয়ে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো তাওহিদের অমর সঙ্গীতের সুমধুর ঐকতান। অভিজাত বংশের লোকেরা নাক ফুলিয়ে বলতে লাগলো— কোন্ সম্প্রদায়ের লোকের মুখ থেকে বের হলো অমন অদ্ভুত ও আজগুবি আওয়াজ? ক্ষেপলো তার স্বগোত্রীয় লোকেরাও। ধ্বনি উঠলো— বাপ-দাদার প্রাচীনতম সংস্কৃতিকে খারাপ ঠাওরালো কোন্ সে মুখ? ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো আশ্-পাশের মানুষও। চিৎকার জুড়ে দিলো ওরা— শান্তি, নিরাপত্তা এবং আমাদের এই মজার (ভোগময়) জীবনের ভিতরে যথেচ্ছ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কী মানে হতে পারে?

মোট কথা; সবাই বিরোধী। বিরোধী তাঁর নিজের খানদান। বিরোধী তাঁর নিজের সমাজ। বিরোধী তাঁর আশ্-পাশের মানুষ। বিরোধী স্বদেশের ঘর-দোর, মরু-পর্বত— সব কিছুই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিলো—
যাকে এ-সৃষ্টিলোকের মাহফিলের সভাপতি বানিয়ে পাঠানো হলো, জমিনের অণু-পরমাণুও বুঝি তার বিরোধী। বিরোধী বুঝি নীলাকাশের ঐ নক্ষত্রপুঞ্জও!

সমুন্নত 'আলোচনা উদ্ধৃতি'র সু সংবাদ

একদিকে মহা দায়িত্ব পালনের তীব্র অনুভূতি ও সচেতনতা। অপরদিকে বিরোধীদের সর্বনাশা বিরতিহীন আক্রমণ। ঠিক তখনই, যখন আরাম ও প্রশান্তি লাভের উপচার ছিলো অবিদ্যমান, তখনই মু'মিনের কানে ভেসে আসে অদৃশ্যলোক থেকে এ-আওয়াজ—
'আমার প্রিয় বান্দা! আমার আনুগত্যের সীমানায় থেকে ঘাবড়ে যাবার ও হিম্মত হারাবার কোনো কারণ নেই!

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

'আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেই নি?' -শরহ: ১

আমি তোমার প্রতি এমন দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি যা কখনো অন্য কোনো বান্দার প্রতি করি নি। মুসা কালীমুল্লাহকে আমার সাথে কথা বলার সম্মানে ভূষিত করেছি ঠিক। কিন্তু এরপরও তার 'বক্ষদেশ প্রশস্ত করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা' অপূর্ণই রয়ে গেছে। এ-নেয়ামত লাভের জন্যে তাকে আমার দরবারে প্রার্থনা করতে হয়েছিলো। তোমাকে তো বিনা প্রার্থনায়ই সে মহান নেয়ামতের অধিকারী করেছি আমি! 'আমার মারেফাত' লাভের জন্য আমি প্রশস্ত উন্মুক্ততায় খুলে দিয়েছি তোমার 'সিনা' (বক্ষদেশ)। আমার কুদরতি নূর ও জ্যোতি দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছি তোমার অন্তর্লোক। আমার আয়াত ও প্রমাণসমূহকে তোমার সামনে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে দিয়েছি। উম্মতের সংস্কার ও সংশোধন-চিন্তায় আমি লক্ষ্য করছিলাম তোমার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। তোমাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিলো এ-চিন্তা— 'মানুষকে কিভাবে সৎ পথে আনা যায়?'

'শিরক'-এর কুপ্রথা ও রীতি-নীতির প্রতি শুরু থেকেই তো তুমি বিরূপ মনোভাব ও ঘৃণা পোষণ করতে। আমার তা অজানা ছিলো না। উম্মতের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে তোমার ধ্যান-তপস্যা, মানুষকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্যে তোমার আকুল ভাবনারা তোমার পৃষ্ঠদেশ ভেঙেই দিচ্ছিলো।

ووضعنا عنك وزرك. الّذي انقض ظهرك.

'আমি তোমার বোঝা লাঘব করে দিলাম, যা ছিলো তোমার জন্যে দুঃসহ'।
-শরহ: ২-৩

আপন অনুগ্রহে ও দয়ায় আমি তোমাকে মুক্তি দান করলাম। শুধু তাই নয়, ওহী'র জ্যোতি দিয়ে তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে সত্য পথের দিশা দিলাম। শুধু তুমিই-যে পেলে সঠিক পথের দিশা তা নয়, বরং অন্যকে সে পথ দেখানোর দায়িত্বও অর্পণ করলাম। এও ছিলো তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের অন্যতম দিক। সুতরাং বিরোধীদের, মানবতার শত্রুদের কুটিল ষড়যন্ত্রে মোটেই ঘাবড়ে যেয়ো না বন্ধু! আমিই তোমার হিফাযতের যিম্মাদার! এরা তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। আজ এই না-লায়েকরা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফন্দি আঁটছে। ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। কিন্তু আমি-যে তোমাকে, তোমার স্মরণকে, তোমার আলোচনাকে পৃথিবীতে সমুন্নত ও সার্বজনীন করে দিয়েছি! যে আলোচনাকে আমি নিজে সমুন্নত করে দিয়েছি, এ-দুর্বল সৃষ্টি—মানুষের পক্ষে সে সমুন্নতির পূর্ণত্ব অনুমান করা কী করে সম্ভব হতে পারে?

ورفعنا لك ذكرك.

'আমি সমুন্নত করে দিলাম তোমার আলোচনাকে'। -শরহ: ৪

এ-বিরুদ্ধচারীরা কী করে তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? বরং উল্টো এরা এবং এদের ষড়যন্ত্রই ধ্বংস হয়ে যাবে, নস্যাত হয়ে যাবে চিরতরে। আর তোমার স্মরণ ও আলোচনায় প্রশংসামুখর মাহফিলগুলো থাকবে চিরকাল এ সব ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল পেরিয়ে— উঁচু হয়ে, ভাস্বর হয়ে, তোমার প্রেমিকদের মুখে মুখে!

বদলে গেলো দৃশ্যপট

পৃথিবীর সামনে এ-আওয়াজ বুলন্দ হয়েছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে, যখন সম্পদ ও নেতৃত্বসহ দেশের সমস্ত শক্তি ঐক্যজোট বেঁধেছিলো। যখন ইসলাম ছিলো অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র ও ভাগ্যবিড়ম্বিত একটি ছোট্ট কাফেলার পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। কেউ আল্লাহ্‌র নাম .. নতুন ধর্মের নাম উচ্চারণ করলে তার পুরস্কার মিলতো— এক রাশ গালি, অপমান, লাঞ্ছনা, চাবুক-পেটাই—বেত্রাঘাত ও জল্লাদি নিষ্ঠুরতা!

কিন্তু! দৃষ্টিবানরা ঠিকই দেখে নিলো, মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে কী অলৌকিক ভাবেই-না দৃশ্যপট পাল্টে গেলো! কুরাইশের অমিত প্রতাপ ও বিপুল শক্তিধর নেতারা মিশে গেলো খাক ও ধুলায়!! নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো তাদের মিত্র বাহিনীও। তছনছ হয়ে গেলো ইহুদীদের ঐশ্চর্য-সিংহাসন, সুরম্য কেল্লা-বাসের সোনালী রূপালী দিনগুলো! আর যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি ও প্রতাপ এবং সম্পদ ও ঐশ্বর্যের গর্ব করতো দুনিয়া, তাদের নাম নিশানাও মুছে গেছে 'আজ-কাল'-এর পাতা থেকে। সাড়ে তেরশ বছরের ব্যবধানে দুনিয়া কোত্থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কতো হাজারো মঞ্জিল পেরিয়ে আসা হয়েছে। খোদাদ্রোহিতা এবং পার্থিব মায়াজালের রাজত্ব ও আধিপত্য লাভ করেছে কতো বিস্তৃতি! কিন্তু—

যে-সৃষ্টির নাম আজ স্রষ্টার নামের পাশে শোভা পায়,
স্রষ্টার নামের সাথে লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ..
মধু ঢালে মানুষের কানে কানে,
যে-নামের গুঞ্জরন মধুর অনুরণন তোলে মানুষের কানের পর্দায় পর্দায়,
তা কোনো 'কায়সার' ও 'কিসরা'-এর নাম নয়,
'জার' (রুশ সম্রাটের উপাধি)এর নামও নয়,
'ফাগফুর' (চীন সম্রাটের উপাধি) এর নামও নয়,
পৃথিবীর কোনো নামকরা কবি-সাহিত্যিকের নামও নয়,
বিদ্বান ও দার্শনিকের নামও নয়,
কোনো জেনারেল ও সেনাপতির নামও নয়,
কোনো 'মহা মনীষী' ও ধর্মযাজকের নামও নয়,
কোনো সাধু-সন্যাসী ও যোগী-দরবেশের নামও নয়,

এমন কি অন্য কোনো নবী-রাসূল ও পয়গাম্বরের নামও নয়,

বরং আব্দুল্লাহর কলিজার টুকরো, মা আমেনার চোখের মণি ঐ অসহায় এতিম ও মরু-দুলালের নাম, (হাজার বার উৎসর্গিত হোক সে নামের তরে আমার জীবন!) যাঁকে দাম্ভিক, অহঙ্কারী, মূর্খ, হঠকারী ও পরাক্রমশালী কোরাইশ মনে করেছিলো মাটির গড়া এক অতি সাধারণ মানুষ মাত্র!

কাশ্মীরের সবুজ-শ্যামলিমা ও রূপের প্রাকৃতিক অপূর্ব বৈচিত্র সম্ভারে,

দাক্ষিণাত্যের সুউচ্চ পর্বতমালায়,

আফগানিস্তানের চূড়ায় চূড়ায়,

হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে,

গঙ্গার বিস্তীর্ণ উপত্যকায়,

চীন, জাপান, জাভা, বার্মা, রুশ, ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, তুর্কী, বুখারা, নজদ, ইয়েমেন, মরক্কো, ত্রিপলী এবং হিন্দুস্তানের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, আর এইসব সভ্য, আধা-সভ্য দেশগুলো বাদ দিলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি লন্ডন, প্যারিস এবং বার্লিনের জনপদে— প্রতি বছরে নয়,

প্রতি মাসে নয়,

প্রতি সপ্তায় নয়,

প্রতিদিনে মাত্র একবার নয়—

অন্তত পাঁচবার সুউচ্চ মিনারচূড়া থেকে যাঁর নাম স্রষ্টার নামের সাথে উচ্চারিত হয় .. গুঞ্জরিত হয়— অন্তহীন শূন্যলোকে, ভেসে বেড়ায় ইথারে, সে শুধুই আল-আমীনের নাম, যাঁকে 'ঐশীজ্ঞান-বঞ্চিত পৃথিবী' সুদীর্ঘ কাল ধরে শুধু একজন অসহায় এতিম হিসাবেই জানতো!!

সমুন্নত আলোচনা'র ব্যাখ্যা

'এতিমের রাজত্ব'-এর অর্থ এ-ই। এই হলো— وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ —'আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করে দিলাম'-এর ব্যাখ্যা!

কোনো অঞ্চল ও প্রদেশের উপর নয়,

কোনো দেশের উপর নয়,

কোনো দ্বীপ-ভূ-খণ্ডের উপরও নয়,

পৃথিবীর উপর, পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের উপর আজ হুকুমত ও শাসন চললে—

চলে সেই এতিমেরই!

সেই উম্মী নবীরই!!

মুক্ত ও উজ্জ্বল চিন্তার লালনকারী কোনো মিসরী যখন এই পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলে তাকায়,

তাঁর নামেই বরকত হাসিল করে।

নির্মল বিশ্বাসের অধিকারী আফগান সন্তানও আশ্রয় খোঁজে তাঁরই পবিত্র নামের মধ্যে।

জানবায তুর্কীবীর দুনিয়াকে চির বিদায় জানায় তাঁরই নামের কালেমা আবৃত্তি করে।

মরক্কোর বীর মুজাহিদ লুটিয়ে পড়ে শাহাদতের রক্তিম শয্যায়—

তাঁরই উঁচু নামের সাক্ষ্য প্রদান করে।

সুতরাং কোনো প্রেমিক কবি যদি এ-সব প্রত্যক্ষ করে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে অবাক বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

بمسر نام الٰهی نام تست ---

'আল্লাহ্‌র নামের পাশে শোভা পায় তোমারই নাম' ..

তাহলে কে চেপে ধরতে পারে তার মুখ?!

ঐশী নেয়ামতের অবতরণ ঃ কঠিনের পাশেই অবস্থান সহজের

এই শক্তিশালী সুসংবাদ, এই সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি —যা কেবল সত্যবাদীর মুখেই উচ্চারিত হতে পারে— আল্লাহ্‌র আইনের এ-ধারাও শুনিয়ে দেয়া হলো যে, প্রতিটি কঠিনের সঙ্গেই আছে সহজ, তখন তাঁর উন্মুক্ত বক্ষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

'নিশ্চয়ই কঠিনের সাথেই সহজ পুনশ্চঃ কঠিনের সঙ্গেই সহজ—দুঃখের সাথে সাথেই সুখ।' -শরহ: ৫-৬

তাফসীরকারদের কারো কারো মতে আয়াতের প্রথম 'সহজ' (য়ুসর) দ্বারা উদ্দেশ্য পার্থিবলোকের নেয়ামতসমূহ এবং দ্বিতীয় 'সহজ' দ্বারা উদ্দেশ্য পরলোকের নেয়ামতসমূহ। একদল মুফাসসিরের মতানুসারে প্রথম 'সহজ' দ্বারা 'নবুয়ত-জীবনের বিজয়ধারার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় 'সহজ' দ্বারা 'খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপকভিত্তিক বিজয়ধারা ও সফলতার প্রতি'। এইসব অর্থ ও ব্যাখ্যা যথাস্থানে সঠিক হতে পারে। তবে এ রূপ অর্থের সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এই পুনরুক্তি দ্বারা হিদায়াতের দরস ও বিস্তারধারার উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তা রাসূল ও তাঁর উম্মতের জন্যে পৃথক পৃথক রূপে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ একটু খুলে বললে বলা যায় যে, 'আবদে কামিল' (পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ 'বান্দা') রাসূলের জীবনে যেমন কষ্ট-ক্লেশ, সংকট ও নির্যাতন সহ্য করার পর স্বস্তি ও বিস্তৃতির হাজারো দরোজা খুলে গেছে, ঠিক তেমনি এই এতিমের অনুসারীদের বেলায়ও এ-ধারা উন্মুক্ত থাকবে। সংকীর্ণতা ও সংকটের পর প্রশস্ততা অর্জন তাদের ব্যাপারেও সুনিশ্চিতরূপে অব্যাহত থাকবে। শর্ত শুধু একটাই— রাসূলের আদর্শের উপর টিকে থাকতে হবে।

অবশেষে আরও ইরশাদ হচ্ছে— যখন তোমাকে গুরুভার-মুক্ত করে দিলাম, যখন উম্মতের ইসলাহ ও সংশোধনের মহা দায়িত্বভার (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানে দীক্ষিত করার দুঃশ্চিন্তা) তোমার বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তার উপর ছেড়ে দেয়ার বদলে আমি নিজেই তা ওহীর আওতাধীন করে দিলাম, এবার তুমিও তাই পরিপূর্ণভাবে আমার হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান জানার, নবুওতের গুরুদায়িত্ব পালনের এবং আমার সৃষ্টিকে সত্য পথের দিশা দানের মহান ব্রতে আত্মনিবেদিত হয়ে যাও। অম্লান বদনে সয়ে যাও এ-পথের সব বাধা-বিপত্তি ও ক্লেশ-যাতনা। আর যে মহান প্রতিপালক তোমাকে এ-সম্মানে ভূষিত করলেন, যিনি হাজারো কঠোরতা ও সংকীর্ণতাকে ঘুচিয়ে তোমার সামনে এ-স্বস্তি ও প্রশস্ততার দরজা খুলে দিলেন, যিনি তোমার নামকে স্বীয় নামের সাথে জুড়ে দিয়ে তোমার আলোচনা ও স্মরণকে চিরন্তন ও অবিস্মরণীয় করে দিলেন, তাঁর ধ্যানে ও তপস্যায় নিজেকে একান্তভাবে সঁপে দাও। সব কিছু উপেক্ষা করে, পরিহার করে, শুধু তাঁর নামের অনুশীলনে, তাঁর মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনায়, শুধু তাঁরই বড়ত্ব ও মহত্ব প্রচারে মনোনিবেশ করো।

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

'অতএব যখন অবসর পাও সাধনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো'। -শরহ: ৭-৮

এতিমের অভিভাবক গোলামের মাওলা

মক্কার সেই এতিমের অবস্থান আজ সবার উপরে। তিনি এখন শুধু সারা পৃথিবীরই মাথার মুকুট নন, বরং বিশ্ব প্রতিপালকের অপার করুণা ও দয়ায় মক্কার এ-এতিমের কারণেই আজ দুনিয়ার সমস্ত নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর, অসহায় থেকে অসহায়তর এতিমরা নিজ নিজ ভাঙা ঝুঁপড়িতে, এতিমখানার ছোট্ট কুঠরীতে এবং বাজারের অলি-গলিতে থেকেও সেই বালাখানা ও রাজপ্রাসাদের আমীরজাদা ও শাহজাদাগণের চেয়েও অনেক বেশী সম্মান ও মর্যাদায় রয়েছে। ঐ সকল সৌভাগ্যবান বান্দা, পার্থিব জীবনের বন্ধনমুক্ত হওয়ার পরই যাদের জন্যে রয়েছে নিরন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি, তাঁদের বিশেষ একটি পরিচিতি এই যে, কেবল আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁরা আজীবন এতিম-মিসকিন ও দুঃস্থ মানবতার মুখে আহার তুলে দেন। তাদের মলিন মুখে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টায় সদা উন্মুখ হয়ে থাকেন। এর পিছনে থাকে না কোনো রকম পার্থিব আবিলতা।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.

'তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেমাকর্ষণে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে'। -দাহর: ৮

অপরদিকে যে সব হতভাগাকে ইহ-পরলোকে অপমান-লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াতে হবে, তাদের বিশেষ আলামত চিহ্নিত করা হয়েছে (আল-কুরআনে) এভাবে যে, তারা এতিমদের সাথে বিশেষ রূঢ় আচরণ না করলেও তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না এবং স্নেহোচিত আচরণ করে না। বরং দাসোচিত আচরণ করে।

كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

'কক্‌খনো নয়, (তোমাদের ধারণা অমূলক) বরং (আসল ব্যাপার হলো) তোমরা এতিমদের প্রতি মর্যাদার আচরণ করো না'। -ফাজর: ১৭

মানবতার মর্যাদার সবচে' বড় ও উঁচু ঘাঁটি, মানবতার মর্যাদার বন্ধুর গিরিপথ পার হাওয়া এবং মানবতার পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব, যতোক্ষণ না বন্দির সাথে ন্যায়ভিত্তিক আচরণ করা হবে, 'গোলামকে' আযাদ করে দেয়া হবে এবং ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর এতিমকে পানাহার করানো হবে এবং এ-অভ্যাসকে জাতীয় স্বভাব ও কর্মসূচীতে পরিণত করা হবে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.

'তুমি কি জানো, কী সেই ঘাঁটি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধার দিনে অন্নদান, এতিম আত্মীয়কে অথবা ধুলিধূসরিত মিসকিনকে'।

-আল-বালাদ: ১২-১৬

এতিমের মেহমানদারী, সেবা-যত্ন ও ইজ্জত-সম্মান করাই ধর্ম পালনের মূল কথা। যে হতভাগা এ থেকে বঞ্চিত, সে বাহ্যিকভাবে যতো নামাজিই হোক, যদি এতিমের অধিকার ও হক সম্পর্কে সে অসচেতন থাকে, তাহলে বৃথা তার ধর্ম পালনের এ-বাহ্যিক অনুষ্ঠান। আসলে সে ধর্মের মিথ্যা দাবিদার। তার ধর্ম পালনের এ-অনুষ্ঠান— মিথ্যা অভিনয় এবং তা অগ্রহণযোগ্য।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ.

'তুমি কি দেখেছো তাকে, যে বিচার ও প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা বলে? সে ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়'। -মাউন: ১-২

পৃথিবীতে এমন ধর্ম আছে কি, যা এতিমকে দিয়েছে এমন সম্মান ও মর্যাদা? যে ধর্ম 'এতিম হওয়া'কে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ মনে করার বদলে গর্ব করার মতো সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে? এক এতিমের বয়ে-আনা এই সত্য দীন ছাড়া আছে কি অন্য কোনো ধর্ম?

এতিমের জয়

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.

‘হে রাসূল! তোমাকে আমি ‘কাউসার’ (অফুরন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ) দান করেছি’। -কাউসার: ১

অসহায়ত্ব এবং হিকমতে ইলাহী

যারা ছিলো বিপুল পরাক্রম ও শক্তির অধিকারী,
তাদের পরাক্রম ও শক্তিকে খণ্ডিত করার জন্যে,
যারা ছিলো গর্বিত ও অহংকারী,
তাদের গর্ব ও অহংবোধকে নিচু প্রমাণিত করার জন্যে,
যারা হিকমত ও হুকুমতের (কূট-কৌশল ও শক্তিমত্তার) মালিক ছিলো,
তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দাসত্বের অসহায়ত্ব ও বিনয় সৃষ্টি করার জন্যে,
সর্বোপরি নিজের কুদরত ও হিকমতের শক্তি ও কুশলতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ও নমুনা প্রদর্শনের জন্যে নির্বাচন করা হলো এমন ব্যক্তিকে—
যাঁর নেই ধনবল।
যাঁর নেই জনবল।
নেই সৈন্য-সামন্ত .. পাইক-পেয়াদা।
নেই তাঁর কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিকমতের পুঁথিগত বিদ্যা।
জন্মের আগেই পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত তিনি!
এক অসহায় বে-সাহারা এতিম তিনি!
আবির্ভূত হলেন তিনি মরু আরবের বুকে।
নির্দেশ হলো তাঁর প্রতি—
শুধু স্বগোত্র ও স্বজাতিরই নয়,
শুধু দেশের পরিসীমারও নয়,
বরং সারা পৃথিবীর ইসলাহ ও সংশোধনের লক্ষ্যে কোমর বেঁধে নেমে যাও!
এ-নির্দেশের সামনে বিবেক বুদ্ধি-হতবাক, বিস্ময়াভিভূত!
মস্তিস্ক অস্থির, দিশেহারা!!

পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপূজারীদের অট্টহাসি

যাদের গর্ব ছিলো নিজেদের তাহযিব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর,
তারা ফেটে পড়লো অট্টহাসিতে, ঝরে পড়লো রাশি রাশি অবজ্ঞা।
যারা ছিলো বাগ্মিতা ও যাদুকরী বর্ণনার দাবিদার,
তারা সোচ্চার হাত-তালি বাজালো, ভাবখানা এমন— 'দেখবে তবে মজা'!
যাদের গর্ব ছিলো নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অশ্লীল ছবির ন্যায় নিজেদের অশ্লীল ও যৌনোদ্দীপক ছন্দকাব্যের উপর,
উচ্চকিত হতে লাগলো তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপের আওয়াজ! ওরা যেনো বলতে চাইলো— আমাদের মধ্যে তুমি আবার কোন্ চিজ!
আর যারা ছিলো বিত্তবান ও প্রাচুর্যের মালিক,
তাদের অহংকারী ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তা-রেখা— একী আপদ! ও আবার কী শুরু করলো? কী চায় ও? এ দেখছি আমাদের জন্যে হুমকি!
আর যে দলটির পুঁজি ছিলো দাপট ও শক্তি, তারা গর্বোস্ফীত বুকে নেমে এলো সাক্ষাত ময়দানেই!

আলো-আঁধারির আলিম্পনা

শুরু হলো লড়াই ও মুকাবিলা। ক্ষমতা ও শক্তির মহড়া।
একদিকে শক্তি। আরেকদিকে দুর্বলতা।
(দুনিয়ার দৃষ্টিতে যা শক্তি, ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং দুনিয়ার চোখে যা দুর্বলতা, অক্ষমতা— তার মুকাবিলা।)
একদিকে সাজ-সরঞ্জামের বিপুল সমাবেশ।
আরেকদিকে সহায়-সম্বলহীন, উপায়-উপকরণহীন এক ক্ষুদে কাফেলা।
একদিকে বাহ্যিক ও লোক-দেখানো সন্ধি স্থাপনের আড়ালে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র। চক্রান্তের পর চক্রান্ত।
অপর দিকে শান্ত পরিবেশে ইবাদত-মগ্ন কিছু অশ্রুভেজা চোখের ব্যাকুল আকুতি!
এখানে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব,
ওখানে দারিদ্র ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা।
এদিকে গর্ব, প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির দাপট।
ওদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ!
দুনিয়ার চোখে যে ছিলো একা, নিঃস্ব ও অসহায়,

তাঁকে নিয়ে সবাই উপহাস ও বিদ্রূপ করে নিলো প্রাণভরে।

সমাজের হর্তাকর্তা ও জাত্যাভিমানিরা তো এই বলে চীৎকারই জুড়ে দিলো—

একটু এসো দেখে যাও, কাকে বলে কল্পনা-বিলাস!

যাঁর নেই ছোট্ট একটা 'কুঁড়েঘর'ও, সেই কিনা স্বপ্ন দেখে 'বালাখানা'র!

'সাত মহলা রাজপ্রাসাদের'!!

যে নিজের অসহায়ত্ব ও দারিদ্র বিমোচনেই অপারগ,

সে দাবি করছে পৃথিবীকে সঠিক পথের দিশা প্রদানের!

সে জোর হিম্মত দেখাচ্ছে সৃষ্টিলোকের সংস্কার ও সংশোধনের!

এইসব ঘটছিলো তাঁরই চোখের সামনে যিনি নমরূদের মাথার মগজকে ফালা-ফালা করে দিয়েছিলেন ক্ষুদে মশক সৈনিককে দিয়ে, যিনি আবরাহার হস্তি বাহিনীকে ছোট্ট ছোট্ট পাখির খোরাক বানিয়েছিলেন এবং এই সাম্প্রতিক কালেও যিনি 'লর্ড কিচেনার' ও লর্ড টমসন[১] কে এবং রুশ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে মুহূর্তে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন!

কোরাইশ কাফিরদের মিথ্যা আনন্দোল্লাস

আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমতের রহস্য বোঝে— কার সাধ্য? লক্ষ্য করুন, এ-হিকমতের তরতাজা বিকাশ ঘটলো নবীজীর জীবনে কীভাবে।

লা-শরীক আল্লাহ্‌র এ-অসহায় বান্দার একমাত্র আদুরে দুলাল, কলিজার টুকরো তাঁর চোখের সামনেই ঘুমিয়ে পড়লো চিরতরে! শত্রুর কষ্টেও যিনি হয়ে পড়তেন বে-কারার—অস্থির, তাঁরই কোলের নিস্পাপ শিশু সন্তান তাঁরই স্নেহভরা কোলে ঢলে পড়লো চিরতরে! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তুমি কতো বেপরোয়া, তোমার হিকমত ও কুদরত বোঝে— কার সাধ্য? যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, বিদ্রোহ করছে তাঁর আইনের বিরুদ্ধে, তাকাব্বুর ও অহংকারভরে প্রত্যাখ্যান করছে তাঁর বাণী, তাদের সন্তান-সন্ততি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেড়ে উঠছে রূপে-রসে-গন্ধে। আর যাঁর সকাল-সন্ধ্যা কাটে প্রতিপালকের স্তুতি-বন্দনায়, তাঁকে এ-নেয়ামতটুকু থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে! তাঁর কাছে নেই ধন-দৌলত, নেই নেতৃত্ব, নেই বড় কোনো দল ও জোট, নেই তাঁর শাগরিদদের জমজমাট কোনো

---

১. বৃটিশ বিমানমন্ত্রী যিনি ১৯৩১ সালে বিমানে অগ্নিকান্ডের ফলে মারা যান।

আসরও। সর্বব্যাপী বিরোধিতার প্রচণ্ড ঝড়। তাঁর সমাজ সংশোধনের প্রতিটি দাওয়াত ও আহ্বানেই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো প্রভাবহীনতা ও অসাফল্য। মোট কথা; বাহ্যদৃষ্টিতে সকল প্রকার পার্থিব নেয়ামতের বঞ্চনা ধরা পড়ছিলো প্রথম থেকেই। অনেক অশ্রুঝরা প্রার্থনার পর লাভ হয়েছিলো যে সর্বশেষ নেয়ামতটি, তাও 'ছিনিয়ে নেয়া' হলো। এ-নাজুক ও শোকাবহ মুহূর্তে কী বলেছিলো আশ্-পাশের লোকজন? তাই, যা সব সময়—সব কালে সব জায়গায় বলে থাকে পৃথিবীর অন্ধ ও দৃষ্টিহীনেরা!

তারা কেউ হাসলো সশব্দে।

কেউ হাসলো মুখ বুজে।

কেউ আবার লুটোপুটি খেলো-ইবলিসী মত্ততা ও আনন্দে।

আস্ ইবনে ওয়াইল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের এক সরদার। দুস্কৃতিকারীদের এক পাণ্ডা। সে বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীদের বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললো ঃ 'চলো ভাই! 'ছুট্টি মিল গ্যায়ী'—নিস্তার পাওয়া গেলো! মুহাম্মদের বংশধর খতম! এখন তাঁর এ-'মিশন'কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ জীবিত নেই! থাকবে না ভবিষ্যতে তার নাম নেয়ার মতোও কেউ! দেখলে তো, আমাদের দেব-দেবীদের সাথে বে-আদবী করার কু-ফল?'

যারা মুহাম্মদকে রক্ত-মাংসে-গড়া একজন অতি সাধারণ মানুষই শুধু ভেবেছিলো, তারা সম্ভবত এ-সমালোচনার ক্ষেত্রে অপারগই ছিলো। আসলে তাদের জানা ছিলো না— কে কিভাবে বিকাশ লাভ করে। কোন্ মাটির কায়ার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে কোন্ পবিত্র আত্মা!

বলা বাহুল্য, এই নিন্দাবাদ ও সমালোচনা পৌঁছে গিয়েছিলো মহাসত্যের চিরসমুন্নত অহংবোধের দরবারেও! সেখানে স্পন্দন দেখা দিলো! দোল্ ওঠলো! ভেসে এলো আওয়াজ—

এ অজ্ঞ, মূর্খ, অপরিণামদর্শী ও উদাসীনেরা তোমার সমালোচনা ও নিন্দা প্রচারে মেতে উঠেছে! এই হতভাগাদের জানা নেই যে, আমি তোমাকে দান করেছি অফুরন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ। তোমার হাতে তুলে দিয়েছি মঙ্গল ও কল্যাণের বিপুল রত্ন ভাণ্ডার।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.

'আমি তোমাকে দান করেছি কাউসার' (অফুরন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ)।
-কাউসার: ১

তোমাকে আমি সমস্ত সুন্দর ও পূর্ণত্বের অধিকারী করেছি। কিসের অভাব তোমার? ইহলোকে কিংবা পরলোকে? যাঁকে দান করি আমি নিজ হাতে, তাঁর সম্পদ ও প্রাচুর্যের হিসাব কি সম্ভব? কিংবা অনুমান? সীমা পরিসীমা করা যাবে কি, তার প্রতি আমার নেয়ামতসমূহের ফল্গুধারার?

যার প্রতি আমি স্বয়ং মেহেরবান ও দানশীল—
তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য,
তার সংকল্পের অবিচলতা ও পূর্ণতা,
তার রূপ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা,
তার সম্পদ ও প্রাচুর্য এবং তাঁর সৌভাগ্য ও সুখ-শান্তির সঠিক হিসাব নিরূপণ— কার সাধ্যে কুলাবে?

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'আমি তোমাকে দান করেছি কাউসার।' এ 'অফুরন্ত কল্যাণ'-এর দাতা আমি ! কী দেয়া হলো? দিয়েছি অনেক- অনে-ক এবং অনেক কাউসার ! কী দেই নি? স-ব দিয়েছি!!

কে দেবে এ-কাউসার-এর ব্যাখ্যা? কোন্ কোন্ শব্দ দিয়ে দেবে? তাফসীরকারগণ আপন আপন মত পেশ করেছেন এখানে। কেউ বলেছেন, 'কাউসার'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাতের 'নহরে কাউসার'। কেউ লিখেছেন অন্যান্য নবী-রাসূলের উপর তাঁকে যে-শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে— 'কাউসার'-এর দ্বারা তা-ই বুঝানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ-সব উদ্দেশ্য হতে পারে, মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের বিশালতাকে কেনো গণ্ডিবদ্ধ সীমানার ভিতর আটকে রাখার এ প্রয়াস? বিস্তৃতি ও বিশালতার উপর এর অর্থকে ছেড়ে দিলেই নয় কি? যা হবে কাউসার এর দাতা–আল্লাহ্‌র শান মুতাবিক?

আল্লাহু আকবার! যাঁর দান ও দয়া সদা অবিরতধারায় বয়েই চলেছে, তাকে 'বাঁধ-চিহ্নিত' করার কেনো এ ক্ষুদ্র প্রয়াস? তিনি নিজে যেখানে বলছেন 'অনেক' 'অনেক' এবং 'অনেক'— নিজের দানের জমিনের বিস্তৃতি ও বিশালতা বুঝানোর জন্য, সেখানে বেচারা সসীম চিন্তার মানুষ কোত্থেকে নিয়ে আসবে কোনো দাঁড়িপাল্লা ও মানদণ্ড? ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনেক কসরত

চালিয়ে কাউসার-এর ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন শিরোনামে। বিভিন্ন আঙ্গিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন–

الكوثر ما لا يحصى من الخبر.

'কাউসার' হলো অগণন মঙ্গল ..অফুরন্ত কল্যাণ'।

আশা করি এবার কাউসার-এর অর্থ এবং তা দিয়ে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।[১]

নিন্দিত নিন্দা

ধিকৃত দুরাচারেরা নিন্দাবাদ দিলো, তোমার উত্তরসূরী খতম হয়ে গেছে এবং তোমার বংশের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়ে গেছে। কান পেতে শুনে রাখো! তোমার বংশ কখনো খতম হতে পারে? থেমে যেতে পারে কখনো তোমার ধারাবাহিকতা? এ হীন নীচ প্রকৃতির লোকগুলো ওদের জীবনকালে দেখে যেতে পারবে না, (কেননা, তার আগেই ওদের মিশিয়ে দেয়া হবে চিরতরে)। কিন্তু এদের আগামী প্রজন্ম ও উত্তরসূরীরা ঠিকই দেখতে পাবে, দেখতে পাবে এ আসমান-জমিন, চাঁদ-সুরুজ ও সিতারাকুল, দেখবে জিন ও ইনসান যে, তোমার বংশধর বেঁচে আছে এ পৃথিবীতে। তোমার বংশের ধারাবাহিকতা চিরঅব্যাহত, চিরবহমান।

পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে বিভিন্ন রাজপরিবারের রাজত্ব, আবার তা ভেঙে যাবে। তৈরি হবে প্রশাসন, আবার তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গড়ে উঠবে শহর-বন্দর-নগর, আবার তা বিরান হয়ে যাবে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় উন্নীত হবে উন্নতি ও উৎকর্ষের চরম শিখরে, আবার তারা হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতল তলে। কিন্তু তোমার নাম থাকবে চির অম্লান হয়ে। তোমার কীর্তি থাকবে চির ভাস্বর হয়ে। তোমার বাণী থাকবে চির শাশ্বত হয়ে। মহা প্রলয়ের আগ পর্যন্ত যেমন থাকবে তা সুপ্রতিষ্ঠিত, মহা প্রলয়ের পরেও

১-عن عكرمة رضي الله عنه قال : الكوثر ما اعطاه الله من النبوة والخير والقران.

عن الحسن قال : الكوثر القران.

عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، قَالَ : حوْضٌ فِي الْجَنَّةِ أُعْطِيه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

থাকবে তা অক্ষয় সমুচ্চ। এই মাটির পৃথিবীতে তোমার নামের এমন ইজ্জত ও সম্মান হবে, যা না-অতীতে কোনো মানুষ লাভ করেছিলো, না-লাভ করবে ভবিষ্যতে কেউ। সুউচ্চ মিনার চূড়া থেকে আমার নামের সাথে উচ্চারিত হবে তোমার নাম। মাঠে-ময়দানে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, নদীতে-সমুদ্রে, জলে-স্থলে, গ্রামে-শহরে-বন্দরে, জন বসতি ও নির্জন মরু-প্রান্তরে, উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশে—সর্বত্র-তোমার নাম ঘোষিত হবে, হবে উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত। হিজায—মক্কা-মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, ইথিওপিয়া, মিসর, ইরান-তুরান, বুখারা, হিন্দুস্তান, চীন, জাপান, রাশিয়া, আফগানিস্তান, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা তথা তামাম বিশ্ব জাহানের কোণায় কোণায় তোমার নাম গুঞ্জরিত হবে। ব্যঞ্জিত হবে। পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমার মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য দেবে। তোমার নাম, তোমার আলোচনা তাদের কানেও পৌঁছে যাবে, যারা পৃথিবীতে প্রেরিত মহা-মানব ও পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে কেবল তোমাকেই চিনবে। আজ এ দৃষ্টিহীনদের চোখে তুমি তুচ্ছ। কিন্তু মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে তুমিই সম্মান ও মর্যাদার স্বর্ণচূড়ায় অধিষ্ঠিত হবে, যখন অন্যান্যদের মান-ইজ্জত ও খ্যাতি ধুলোয় মিশে যাবে। যারা দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার বাণী গ্রহণ করবে না। মানবে না তোমার দেখানো পথ, তারাও অন্তত তোমার অবস্থান ও মর্যাদার কথা অবশ্যই জানতে পারবে।

আত্মিক সন্তান

তোমার ঔরসজাত সন্তানদের বিকল্পরূপে আমি সৃষ্টি করতে থাকবো কেয়ামত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি সংখ্যায়— তোমার রূহানী সন্তান। আহ! লক্ষ, কোটি বলছি কেনো? আসলে মানুষের পক্ষে তাদের সংখ্যা-নিরূপণই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তাদের কাছে তোমার সম্মান ও মর্যাদা হবে সবচে' বড়। তোমাকে তারা ভালোবাসবে প্রাণ খুলে, হৃদয়-মন উৎসর্গ করে। কেমন সে ভালোবাসা? এ ভালোবাসা পিতা-পুত্রের ভালোবাসার চেয়েও অধিক বেশী। শুধু তোমারই রেযামন্দি ও সন্তুষ্টিতে তারা নিজেদের মুক্তি ও নিস্কৃতির পথ তালাশ করবে। উঠতে বসতে তোমারই পবিত্র নামে, পবিত্র কালেমায় আন্দোলিত হবে তাদের ঠোঁট। তোমার স্মরণে প্রতিদিন পঠিত হবে অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। তোমার নামের জপমালায় তারা থাকবে আত্মবিভোর।

সকাল-সন্ধ্যায়, রৌদ্রজ্জ্বল দিনের প্রোজ্জ্বল আলো ও গভীর রাতের তিমির আঁধারে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে, প্রতিপলে তাদের কাছে তোমার নামের এমন ইজ্জত ও সম্মান হবে, যা কোনোদিন কোনো সন্তান কোনো বাপকে না-আজ পর্যন্ত করেছে, না-ভবিষ্যতে করবে। আমি কতোজনকে সম্মান দান করেছি, কতোজনকে রাজমুকুট পরিয়েছি, কিন্তু তোমাকে আমি যে-সম্মান, যে-মর্যাদা দান করলাম, তা শুধু তোমারই জন্যে।

সীরাতে পাকের মাহাত্ম্য

তোমার কণ্ঠনিঃসৃত এক-একটি কথা, এক-একটি বাণী সংরক্ষিত হবে। সংকলিত হবে। আর তাও হবে এমন সীমাহীন গুরুত্ব ও ভক্তি-ভালোবাসা এবং নজিরবিহীন গবেষণা ও নির্ভুল সনদ-প্রমাণ সহকারে, যার একটি মাত্র নমুনাও পৃথিবীর কোনো ইতিহাস পেশ করতে পারবে না। তোমার জীবন-চরিত এমন বিশদভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৃথিবীর স্মৃতি ভাণ্ডারে থাকবে অমলিন ও সুরক্ষিত হয়ে, যার নজির যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো রাজাধিরাজ সম্রাটের জীবনগাথায়, তেমনি পাওয়া যাবে না অন্য কোনো নবী-ওলীর জীবন চরিতে।

তোমার ওঠা-বসা,
তোমার চলা-ফেরা,
তোমার ইশারা-ইঙ্গিত,
তোমার হাসি-কান্না,
তোমার নিদ্রা-জাগরণ,
তোমার পানাহার-উপবাস—
এ-সবের এক-একটি খণ্ড,
এক-একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ চিরদিন সুরক্ষিত হয়ে থাকবে।

কোটি কোটি মানুষ তোমার দেখানো-পথ ধরে চলাকেই মনে করবে নিজেদের মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ। তোমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজের বিশদ ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় সংকলিত হবে শত শত কিতাব। রচিত হবে সে সব কিতাবের অগণিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থ।

তোমার নিজের শান ও ব্যক্তিত্ব— সে তো অনেক বড় ও উঁচু! যারা মাত্র এক নজর তোমাকে দেখেছে বরং যারা তোমার সাহাবীদেরকেও এক নজর দেখেছে, তাঁদেরকেও চির স্মরণীয় করে রাখা হবে! তাদের জীবন-কথা

নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহও ইতিহাসের 'মিউজিয়ামে' বর্ণে বর্ণে সুরক্ষিত থাকবে। পৃথিবী ভুলে যাবে বড় বড় দার্শনিকদের কথা। ভুলে যাবে বড় বড় রাজা-বাদশার কাহিনী। কিন্তু ভুলতে পারবে না শুধু এ নিরক্ষর, অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট গেঁয়োদেরই— যাদের বৈশিষ্ট্য শুধু এই-একটিই যে, তারা তোমাকে এক পলক দেখেছে! দারা, আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস, জুলিয়াস, সিজার, নেপোলিয়ন, মুসোলিনী, জালিনূস (গ্যালেন), বোকরাত, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, এরিস্টোটল, প্লেটো, বিউটন, ও হার্বার্ট স্পেনসার, এরা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন আপন আপন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কীর্তি ও অবদান এবং বহু-দেশ-বিজয়ের নায়ক হিসাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এরা একদিন বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যাবে। ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এদের কীর্তি ও অবদানের শেষ চিহ্নটুকুও। কিন্তু এ পৃথিবীতে যদি সময়ের চিরন্তন ফলকে কারো নাম খোদিত থাকে, তবে সে নাম হবে তোমার, তোমার গোলামের! তোমার গোলামের গোলামের!! তোমার গোলামের গোলামের গোলামের!!! ....

রাসূলের উত্তরসুরী—রুহানী সন্তান

তুমি উম্মী। বর্ণলিপির সাথে তোমার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু তোমার মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য দেবে এমন সব মনীষী, নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় এবং কীর্তি ও অবদানের জন্যে যারা অলংকৃত করে রাখবে ইতিহাসের উচ্চাসন। স্ব-স্ব বিষয়-ভিত্তিক গবেষণায় স্থাপন করবে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। এদের কেউ কেউ তোমার বাণী ও উক্তির সঠিক সংকলন ও তার ব্যাখ্যা-ভাষ্য লিখে লিখে কাটিয়ে দেবে সারা জীবন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনে হাজার আসকালানী ও ইবনে জাওযীর মতো স্বনামধন্য হাদীসবিশারদদের কাতারে শামিল হওয়াকে মনে করবে নিজেদের জন্যে চরম ও পরম সৌভাগ্য।

এদের মধ্যে এক জামাত তোমার বলে যাওয়া হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান অধ্যয়নে থাকবে বিভোর হয়ে। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা চালিয়ে তা থেকে নতুন নতুন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে বিভিন্ন মাসায়েল ও আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নিজেদের জীবন ওয়াক্‌ফ করে দেবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক,

ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম নাখয়ী ও ইমাম মুযানীর মতো লোকেরা ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে ডুবে থেকে ধন্য মনে করবে নিজেদের জীবন। এক জামাত তোমার আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুরাগী হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় ও আল্লাহপ্রাপ্তির তপস্যায় নিরত রাখবে নিজেদেরকে। সে পুণ্য কাফেলায় জন্ম নেবে হাজারো জুনাইদ বাগদাদী, শিবলী, জিলানী ও মুঈনুদ্দীন আজমিরী। তোমারই প্রদীপ থেকে তাঁরা যুগ-যুগ ধরে বংশানুক্রমে নিজেদের প্রদীপ আলোকোজ্জ্বল করে রাখবে। মহাকবি রুমী, মহাকবি হাফিজ, মহাকবি সাদী, সুনায়ী, আকবার এলাহাবাদী এবং আল্লামা ইকবাল নিজেদের কবিত্বের পূর্ণতাকে উৎসর্গ করে দেবে তোমারই স্তুতিগানে ও আনুগত্যে। আবু হামেদ আল-গাযালী, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী তোমার বাতানো শরীয়তের হাকীকত ও রহস্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই খুঁজে ফিরবে নিজেদের মুক্তি ও সফলতা। আর ইমাম রাযী, তূসী, ফারাবী ও ইবনে সিনাকে বিজ্ঞান ও যুক্তির তুফানের প্রচণ্ডতার ভিতরে কোথাও যদি আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে তা নিতে হবে তোমারই পতাকার ছায়াতলে। হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ, সুলুক ও তাসাওউফ, কালাম বা দর্শন এবং এ ছাড়া ইলম ও জ্ঞানের আরো কতো বিষয় সৃষ্টি হবে এ পৃথিবীতে। তা হবে শুধু তোমারই দেখিয়ে-যাওয়া পথকে সুগম করার জন্যে। ইলম ও জ্ঞানের কতো পতাকাবাহী সর্বদেশে সর্বজাতিতে এবং সর্বকালে নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞানলব্ধ সাধনা ও তপস্যা উৎসর্গ করবে কেবল তোমারই সেবায়। বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন তোমার এবং তোমার আনীত ধর্মের দুশমনদের কেন্দ্রভূমি হবে ঠিকই, কিন্তু তোমার নাম আমার নামের সাথে যুক্ত হয়ে সেখানেও প্রতিদিন একবার নয়, অন্তত পাঁচবার ধ্বনিত হতে থাকবে উঁচু মিনার থেকে। তোমাকে আমার 'কাউসার' দানের কথা পৌঁছাতে থাকবে বিরামহীন ভাবে।

পরিণতির বর্ণোজ্জ্বল আকাশ

মাটির পৃথিবীতেই এ-সব হবে। পৃথিবীর মানুষ বাহ্য-দৃষ্টি দিয়ে তা দেখে যাবে। যদিও পরলোকে মুমিনের সুখ-জীবন প্রত্যক্ষ করার কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনাও এদের কপালে নেই। কুরআন ও নবুওতের ভিতর যে অফুরন্ত নেয়ামত মূর্তিমান হয়ে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে এবং

'শাফাআতে কুবরা' (মহা সুপারিশ), হামদ ও স্তুতির পতাকা সমূহ, হাশরের ময়দানের হাউয ও জান্নাতের ঝরনাধারাসহ হাজারো নেয়ামতের মান ও মূল্যের ধারণা তো কেবল তখনই হতে পারে যখন এই শাব্দিক বিষয়গুলো বাস্তবের প্রতিকৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে। আফসোস! তখন—সেই কঠিন সময়ে–আক্ষেপ, অনুতাপ, লজ্জা ও অস্থিরতা কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু এ দৃশ্যমান মাটির পৃথিবীতে যা সামনে আসার তা তো আসবেই, সে জন্যে দীর্ঘ প্রতিক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে। পরিস্কার ফুটে উঠবে—

এক ঔরসজাত সন্তানের বদলে
অসংখ্য ও বে-হিসাব রূহানী সন্তান তোমাকে দান করে,
তোমার নাম উজালা করে,
তোমার 'মিশন'কে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে,
'কাউসার দান'-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কী অলৌকিক ভাবেই না দেয়া হয়!

আল্লাহ্‌র হক নামায, বান্দার হক কুরবানী

মোটকথা; দাতা হলেন সেই মহান সত্ত্বা, যিনি লা-শরীক অদ্বিতীয়। যাঁর নেই কোনো নজির ও নমুনা। নেই কোনো সমকক্ষ ও সমতুল্য। আর দান হলো এমন জিনিস, যা অতীতেও কেউ কোনোদিন লাভ করে নি এবং ভবিষ্যতেও জুটবে না কারো নসীবে। আর গ্রহীতা? এমন কেউ নন যিনি দান-দক্ষিনা এবং দয়া ও অনুগ্রহ পেয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতম ভাটা পড়তে দিতে প্রস্তুত হবেন। তাঁর সুকুমারবৃত্তির সুকুমার অভিলাষ অনুসারেই তাকে হুকুম করা হলো তিনি যেনো সর্বক্ষণ আপন প্রতি-পালকের যিকিরে মশগুল থাকেন এবং সালাত আদায় ও কুরবানী প্রদানে নিজেকে নিরত রাখেন।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানী দাও'।
-কাউসার: ২

এখানে স্পষ্টভাবে দু'টি ইবাদতের কথাই বলা হয়েছে। এক— সালাত, দুই— কুরবানী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি ইবাদতই সমস্ত ইবাদতের সার

নির্যাস। আল্লাহ্‌র হক আদায়ের যতো ক্ষেত্র ও দিক হতে পারে, সে সবই এঁকেবেঁকে এসে মিলিত হয়েছে সালাতের মোহনায়। আর বান্দার হক আদায়ের মূলকথা এসে গেছে কুরবানীর ভিতরের গভীরতায়। আর নবীজীকে এ হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা প্রদান পূর্বক উম্মতকে এ-দরস ও সবক দেয়া হচ্ছে যে, যখন দয়া ও অনুগ্রহের বারিপাত চলতে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা হলো আল্লাহ ও বান্দার হক আদায়ের কর্তব্যে নিজেকে সর্বতোভাবে ব্যাপৃত রাখা এবং গাফিলতি ও উদাসিনতার সামান্যতম স্পর্শ থেকেও বেঁচে থাকা।

মক্কার এতিমের ফাত্‌হে মুবিন

সত্য ও সততার ভবিষ্যদ্বাণীর একাংশ পুরা হতে দেখে আসছে শত্রু-মিত্র সকলেই। আজ থেকে নয়, সাড়ে তেরশত বছর ধরে। এর দ্বিতীয়াংশও কম প্রভাব বিস্তারকারী নয় আপন সত্যতার ক্ষেত্রে। বিরোধ এবং বিরোধীদের যখন চারদিকে সাজসাজ রব, তখনও নিঃশংক ও ঝাঁঝালো কণ্ঠে ইরশাদ হয় যে—

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ.

'তোমার শত্রু, সে-ই লেজকাটা—নির্বংশ'। -কাউসার: ৩

তোমার দুশমনদের নাম-নিশানাই মুছে যাবে। অন্তরদৃষ্টিহীনরা আজ বংশধর ও সন্তান-সন্ততির সংখ্যাধিক্যে গর্ব করছে। দাপট দেখাচ্ছে। দুনিয়াতে বংশের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে কাল-কালান্তরে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে। নিজেদের সাফল্য ও অগ্রগতির দাবি করছে। নিজেদের তথাকথিত সুখ-শান্তিতে হর্ষোল্লাসে মেতে উঠেছে। তোমার সন্তানদের মৃত্যুতে এই বলে র্ভৎসনা ও নিন্দাবাদ দিচ্ছে যে, তোমার নাম নিশানা মুছে যাবে?!

না! অসম্ভব!!

তোমার নয়— এদের নাম নিশানাই মুছে যাবে।

তোমার কর্মধারা থাকবে চির অব্যাহত ও নিরন্তর গতিময়।

তোমার নাম নিশ্চিহ্ন হবে না— নিশ্চিহ্ন হবে তাদেরই নাম।

তোমার আলো নির্বাপিত হবে না— নির্বাপিত হবে এদেরই 'আলো'।

তোমার নয়— এদেরই ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি নিস্তানাবুদ হয়ে যাবে। বরবাদ ও ধ্বংস হবে এদেরই সন্তান-সন্ততি।

এদের ফুল বাগানকেই চিহ্নহীন করে দেয়া হবে।
এদের বংশধরকেই মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে।
এরা খ্যাতি ও যশের কাঙাল।
কিন্তু এদের সে-আশা পূরণ হবে না।
এদেরকে তলিয়ে দেয়া হবে বিস্তৃতির অতল তলে।
ইতিহাস এদের নামের উপর অভিসম্পাত করবে।
ইনসানিয়াত তার বংশ তালিকায় এদের নাম জুড়তে লজ্জায় মরে যাবে।
কেউ কোনোদিন এদের নাম মুখেও উচ্চারণ করবে না। চাইবেই না।
প্রকাশ করবে না এদের জন্যে সামান্যতম সমবেদনাও। কক্‌খনো না।

* * *

কিছুদিন পর পৃথিবী কী প্রত্যক্ষ করলো?
এই সাড়ে তেরশ বছর ধরে পৃথিবী কী দেখে আসছে?
আবু জেহেলের কবরের কোনো চিহ্ন আছে?
আজ কেউ খুঁজে পাবে তার সমাধির ধুলিকণার চিহ্ন?
আবু লাহাবের 'স্মৃতিসৌধ' আজ পর্যন্ত কেউ তালাশ করে পেয়েছে?
আস্ ইবনে ওয়াইলের বংশধররা পৃথিবীর কোন্‌খানে বাস করছে?
উমাইয়া ইবনে খালফের কীর্তি ও অবদানের প্রশস্তি লেখা আছে—
ইতিহাসের কোন্ ছত্রে?
ওলীদ ইবনে মুগীরার 'বৈশিষ্ট্যময়' জীবন-চরিত কার মুখে উচ্চারিত হয়?
ওতবার বংশধরের কোনো নাম-নিশানা কোথাও খুঁজে পাবে কি তুমি?
কোথায় হারিয়ে গেলো কোরাইশ নেতৃবর্গের নেতৃত্ব বাহাদুরী ..
মক্কার সরদারদের সরদারী?
এ-পৃথিবীর বুকে এমন কোনো খান্দানের সন্ধান কি তুমি পেয়েছো, যে নিজের বংশ তালিকা জুড়ছে ঐ-সব খোদাদ্রোহী ও সীমালংঘনকারীদের নামের সাথে?!

দুরূদ ও সালাম

এদের কথা বাদই দিন না! তাদের পর থেকে হাজার দেড় হাজার বছরের সুদীর্ঘ সময়ের হিসাব গ্রহণ করুন। সর্বযুগীয় ও সর্বদেশীয় ইতিহাসের পাতায় একটু নজর বুলিয়ে দেখুন; মুহাম্মদের সাথে যে-ই দুশমনি

করেছে— কী হয়েছে তার পরিণতি? তাদের কার ভাগ্যে জুটেছে সম্মান ও মর্যাদা?

স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যাঁর প্রশংসা, যাঁকে নিজে ডেকেছেন 'মুহাম্মাদ— সমুচ্চ প্রশংসিত' বলে, তাঁর কুৎসা ও নিন্দায় যে-ই মুখ খুলেছে, সে-ই নিপাত গেছে। যে-ই তাঁর সাথে টক্কর দিতে এসেছে, সেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যে-ই তাঁর সাথে গোস্তাখির দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাকেই পিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাকে নিঃসন্তান হওয়ার কারণে নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা শুনতে হয়েছে, পৃথিবী দেখছে এবং দেড় হাজার বছর ধরেই দেখে আসছে যে, আজ সর্বত্রই রয়েছে তাঁর সংখ্যাতীত বংশধর ও সন্তান-সন্ততি। যাঁর অসহায়ত্ব ও অ-খ্যাতিতে বিদ্রূপের ঝড় বইয়ে দেয়া হয়েছে, আজ তিনিই সমস্ত নামী-দামী সরদার এবং খ্যাতিমানদের মাথার মুকুট। যাঁর নামকে মনে করা হয়েছিলো মৃতবৎ, আজ সেই নামের তরেই উৎসর্গিত হচ্ছে হাজারো প্রাণ। সেই নামের উপরই পঠিত হচ্ছে লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম। তাঁর 'ওসীলা'ই নাজাত ও মুক্তির সোপান এবং তাঁরই নাম আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে উচ্চারিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

এক কথায়; আল্লাহ্‌র নামের পরই তোমার নাম—চিরমহিমান্বিত।

মূর, মারগুলিয়াস, ওয়েল হাউসেন ও সেল পাশ্চাত্যে এবং তাদের মতো হাজারো নয় বরং লাখো দুর্ভাগা প্রাচ্যে সম্মিলিতভাবেও কি এই সম্মান ও খ্যাতি লাভ করতে পেরেছে? স্বীয় নাম ও কামকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে কি?

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মদ...........

দু'টি পথ

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের স্বীকারোক্তি,
হৃদয় রাজ্যে সূচিত হলো বিপ্লব

মাসের পর মাস সীমাহীন গরম, প্রচণ্ড সূর্যতাপ, লু-হাওয়া, অগ্নিঝরা দুপুর আর প্রচণ্ড গরমের ভীষণ কষ্টভোগের পর যখন বৃষ্টি-পূর্ব শীতল-বায়ু বইতে শুরু করে তখন আকাশে দেখা যায় জমাটবাঁধা বাদলের আনাগোনা—লুটোপুটি। হঠাৎ নামে ঝমঝম বৃষ্টি। অঝর ধারায়। ভরে যায় মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা।

ঠিক তেমন করেই বহু বছরের কষ্ট-ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করার পর আল্লাহ্‌র ইচ্ছে হলো (যাঁর ইচ্ছার উপর অন্য কারো ইচ্ছা চলে না) মৃতপুরীতে 'জীবন' সঞ্চারিত হোক! শুষ্ক ও নির্জীব পৃথিবী ভরে উঠুক সবুজ শ্যামলিমায়! মৃদু সমীরণের তালে তালে কাঁপন ধরুক কচি কচি সবুজ পাতায়। তখন ঘুরিয়ে দিলেন তিনি মানুষের মনের গতি। হৃদয়-কন্দরে সূচিত করলেন এক ইনকিলাব—সবুজ বিপ্লব। তখন অহংকারী উদ্ধতরা হলো বিনয়াবনত। যে-মুখে শোনা যেতো অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের কড়া কথা, সে-মুখ থেকেই উচ্চারিত হতে লাগলো হক ও সত্যের আবেগাপ্লুত বাণী। হক ও সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার হৃদয়োৎসারিত অপূর্ব শব্দমালা। যে-হৃদয় কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতায় পাথরকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলো, তা নরম হতে হতে হয়ে গেলো পানির চেয়ে আরো নরম। যারা তৈরি হচ্ছিলো জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবে, তাঁরাই এখন দৌঁড়ে দৌঁড়ে ছুটে চলছেন জান্নাতের দিকে। মক্কার যে জমিন তাওহিদের নিশানবরদারদের জন্য হয়ে পড়েছিলো একেবারে সংকুচিত, এখন সে জমিনই দেশ-বিতাড়িত সেই অসহায় এতিমের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় এবং বিজয় ও সাফল্যের সামনে নিজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ স-ব সঁপে দিলো। কা'বার দুয়ার আজ সেই সব হিজরত করে-যাওয়া পরদেশীদের হাতে, উঁহু .. বরং কা'বার প্রকৃত খাদেমদের হাতেই উন্মোচিত হলো। যেখানে আল্লাহ্‌র নাম মুখে-আনা ছিলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাঁরই নামের মাহাত্ম্য আজ ধ্বনি তুলছে আরবের সর্বত্র। তাঁর যে বান্দাকে মক্কাবাসীরা অসম্মান করেছিলো, তুচ্ছ

ভেবেছিলো, আর তায়েফবাসীরা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছিলো, তাঁর সততা ও মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে তায়েফ, নজদ, হিজায, ইয়েমেন, উমান এবং মরু পাহাড় ও বিয়াবানের আবাল-বৃদ্ধি-বণিতা নির্বিশেষে সকলেই কী এক আকর্ষণে এবং কী এক আবেশে আজ দলে দলে ছুটে এসেছে ব্যাকুল হয়ে। যে অক্ষম অসহায়কে (গীবনের ভাষায়) রাতের তিমির আঁধারে শুধু একজন সঙ্গীসহ স্বদেশের আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো, আট বছর পর তিনিই ফিরে এলেন সে শহরে, যে শহরের সবাই তাঁর সাথে দুশমনি করার রক্ত-শপথ নিয়েছিলো। প্রবেশ করলেন তিনি এমন বেশে যে, তাঁর সাথে ছিলো দশ হাজার লৌহ (হৃদয়) মানব। আর তখন নবুওত-সূর্যের দৃশ্য ছিলো এমন শান-শওকতপূর্ণ, যা দেখে ইসলামের দুশমনদের দৃষ্টি হয়েছিলো বিস্ফারিত! বিস্ময়ে বিমূঢ়!!

এক ঐতিহাসিক এরই চিত্র অংকন করেছেন এ-শব্দশালায়—

'মুসলিম সৈনিকগণ যখন মক্কার দিকে ধাবিত হলেন, তখন নবীজী হযরত আব্বাসকে বললেন ঃ 'আবু সুফিয়ানকে পর্বত চূড়ায় দাঁড় করিয়ে দাও। আজ সে স্বচক্ষে দেখে নিক আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকদের শান-শওকত।' একটু পর ইসলামের দরিয়ায় তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুরু হলো। আরব গোত্রের ফেনিলোত্তাল তরঙ্গরা আছড়ে পড়তে লাগলো। প্রথমেই পরিদৃষ্টি হলো গিফার কবিলার পতাকা। তারপর মুযায়না, তারপর মিযয়াম, তারপর সুলায়ম, তারা অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে গগনবিদারী তাকবীরধ্বনি তুলে এগিয়ে গেলো। প্রতিবারেই বিস্মিত ও হতভম্ব আবু সুফিয়ানের বুকের কাঁপন বাড়ছিলো। সবশেষে এলেন বিপুল অস্ত্রসম্ভারসহ কবিলায়ে আনসার। চক্ষু স্থির হয়ে গেলো! পেরেশান হয়ে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন— এরা কারা? কোন্ লশকর? হযরত আব্বাস নাম বলে দিলেন। ঠিক তখনই ফওজের সিপাহসালার হযরত সা'দ ইবনে 'উবাদা নিশান হাতে তার কা'ছ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তাকে দেখে চীৎকার করে বলে উঠলেন—

اليوم يوم الملحمة .. اليوم تستحل الكعبة

'আজ যুদ্ধের দিন! আজ কাবাঘর হালাল করার দিন'।

সবার শেষে উদিত হলেন নবুওত-সূর্য, যার আলোক রশ্মিতে জমিনের উপর রচিত হলো নূরের বিছানা। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম ছিলেন এই বাহিনীর নিশানবরদার—পতাকাবাহী!

বাতিলের সরদারির দিন শেষ

দেখতে দেখতেই কয়েক বছরের ভিতরে দুনিয়ার দৃশ্যপট পাল্টে গেলো। এখন রাজত্ব মক্কার উম্মী নবীর। বনু হাশিমের এতিমের হাতেই উড়ছে বিজয় নিশান। আবু জেহেলের দম্ভ ও দর্প, ওতবার সরদারী ও নেতাগিরী আর আবু লাহাবের প্রাচুর্য ও আধিপত্য— সব হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলে। আস ইবনে ওয়াইল, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওলীদ ইবনে মুগীরার গর্ব-দর্প— সব শেষ। এদের কোনো ভাই, ভাতিজা, পুত্র, প্র-পৌত্র কোথাও থেকে থাকলে এ-আশা আকাঙ্ক্ষায়ই তারা বিভোর— যদি রাসূলের বাহনের পা'দানিটা একটু চুম্বনের সৌভাগ্য হতো! যদি তাঁর পদধুলি চোখে মাখার একটু সুযোগ মিলতো!

নুসরতে ইলাহী

এই বিস্ময়কর দৃশ্য স্বপ্নলোকে নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাধনাবলেও নয়, জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এ-কথাও তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে— যা কিছু হয়ে গেলো, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত নুসরতের বাস্তবায়ন; সাহায্যের চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ আগেই করে রেখেছিলেন। যথা সময় আগত হলে তা মূর্তিমান হয়ে সামনে এসে হাজির হলো। আল্লাহ্‌র সাহায্য তো যথা সময়ই আসে!

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.

'যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়' -নাসর: ১

নইলে বড় থেকে বড় কোনো শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও হিম্মতের বলে এবং অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও বাহুবলে এমন মহান ও কালজয়ী বিপ্লব সৃষ্টি— মোটেই সম্ভব ছিলো না। তাই এ-বিজয় ছিলো আল্লাহ্‌র সাহায্যের জীবন্ত প্রতিফলন। সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র সাহায্যের ধরন ও প্রকৃতি হয় সূক্ষ্ণ ও ঝাপসা। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরাই যা কেবল অনুধাবন করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ-বিজয় এমন সরাসরি ও খোলাখুলি অর্জিত হয়েছিলো যে, একজন অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষের পক্ষেও তা বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। একজন নির্বোধের জন্যেও তা অনুভব করা সম্ভব ছিলো। গতানুগতিকধারায় বিজয় অর্জন তো অন্যান্যদের পক্ষেও

সম্ভব ছিলো। 'দেহ' বিজেতার সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে নগণ্য নয়। কিন্তু এ ছিলো নবীর বিজয়। আল্লাহ্‌র সবচে' বড় 'আবদে শাকুরের'[১] বিজয়। এ আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস, নেপোলিয়ন ও হিন্ডোনবুর্গ-এর বিজয় নয়। এ বিজয় অর্জনের পর এ কথা মনে করিয়ে দেয়া হয় নি যে, রাষ্ট্রের পরিধি কী পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করেছে। রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার কী পরিমাণ বেড়েছে এবং প্রজাকুলের সংখ্যা কতো দাঁড়িয়েছে। বরং পয়গাম্বরসুলভ মনোভাবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে ইরশাদ হয়— এই বিজয়ের প্রভাব ও ফলাফলের ভিতরে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্যণীয় প্রভাব হলো এই যে, যে-ধর্মে শামিল হতে একজন দু'জন মানুষও ভয় পেতো, সে-ধর্মেই আজ মানুষ শামিল হচ্ছে দলে দলে, ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায়, গোত্রে গোত্রে, প্রকাশ্য দিবালোকে, স্বঘোষিতভাবে এবং নিঃশংক ও দ্বিধাহীন চিত্তে! আর এ কোনো মানব সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে নয়, কোনো গোত্র, জাতি, রাজ্য, বর্ণ, বংশ ও দেশের ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্যেও নয়, ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ-এর উত্থান-পতনের লক্ষ্যেও নয় বরং 'ফী দীনিল্লাহ' শুধু আল্লাহ্‌র নামের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তনের জন্যে, তাওহিদের একক ইবাদতের জন্যে!

বিজয়ের এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে শত সহস্র মানুষ নিজ নিজ হাতিয়ার সমর্পণ করছিলেন না। রাজনৈতিক কোনো ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের কোনো চুক্তিপত্রেও স্বাক্ষর করছিলেন না। বরং দলে দলে সবাই ইসলাম কবুল করছিলেন। তাওহিদের কালেমা আবৃত্তি করছিলেন। হাসিল করছিলেন ক্ষমা ও মুক্তির সনদ।

এই কিছুদিন আগেও যারা ছিলো আলোর নবী আল-আমীনের রক্ত পিয়াসী, সবাই আজ সে মহান প্রদীপের আশ্-পাশে পঙ্গপালের ন্যায় জীবন বিলিয়ে দিতে ছুটে আসছে। স্বীকার করি; পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা আছে আরো অসংখ্য বিজয়গাথা। কিন্তু এমন বিস্ময়কর বিজয়ও কি ইতিহাস দেখেছে? এমন অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বিজয়-যে নিছক আল্লাহ্‌র সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে— সে কথা কে-না মানবে?

---

১. أفلا أكون عبدا شكورا

পৃথিবীর মানুষ যখন বিজয়ের গৌরব অর্জন করে তখন সাধারণতঃ কী দৃশ্য নজরে পড়ে? নৃত্যের তালে তালে গান-বাজনার সুরলহরী সৃষ্টি করে এগুতে থাকে বিজয়োল্লাসের শোভাযাত্রা। দেশব্যাপী উদযাপিত হয় বর্ণাঢ্য বিজয়োৎসব। জমজমাট হয়ে ওঠে বিজয়ভোজ ও মদিরাপানের রঙিন আসর। আর আল-আমীনের এ-বিজয় একদিকে বিজয় হিসারে যেমন ছিলো বেনজির—তুলনাহীন, অপরদিকে সুফল পরিণতি বয়ে-আনার দিক থেকেও ছিলো বেনজির—তুলনাহীন।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.

'তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে'। -নাসর: ২

আর এ-বিজয় অর্জনের পর এই নির্দেশও দেয়া হয়নি যে বিজয়োৎসব পালনের জন্যে শহরকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হোক। বের করা হোক কোনো রাজসিক শোভাযাত্রা বরং ইরশাদ হয়— 'হে নবী! এখন পরিপূর্ণতা লাভ করলো দীন ইসলাম। সৃষ্টিলোকের কাছে পৌঁছে দিয়েছো তুমি সত্যের মহা পয়গাম। আর সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে মহান স্রষ্টার ইচ্ছায় নিজের আত্মাকেও তো কম কষ্ট দাও নি তুমি! ব্যাস, এখন নিজের আসল আবেগ-অনুভূতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাহ্যিক ভাবেও নিজের হৃদয়-মন সঁপে দাও একান্ত করে মহান স্রষ্টার ধ্যানে-স্মরণে-সান্নিধ্যে। আত্মনিবেদন করো প্রশংসাযোগে তাঁরই মহিমা কীর্তনে। তাঁর কাছেই বলো— সব চাওয়া-পাওয়া ও সাফল্যের কথা। তাঁর কাছেই বলো তোমার সার্বিক হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা। তিনিই তোমাদের রিযিকদাতা, পালনকর্তা, তিনিই তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক। মুরব্বী। ক্ষমাশীল তিনি। তওবা কবুল করেন তিনিই। তোমাদেরকে ঘিরে আছে তাঁর অপার দয়া ও করুণা।

হুকুম তা'মিলের অনন্য নমুনা

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শানে-বেনিয়াযী—মুখাপেক্ষিহীনতার কী অপূর্ব ঝলক! আবদিয়াত ও দাসত্বের পরিপূর্ণতা কী ভাবেই-না তলব করা হয়েছে! ক্ষমা প্রার্থনার হুকুম করা হচ্ছে সেই তাঁকে, যিনি নিরপরাধ, নিষ্পাপ! নিষ্পাপদের ইমাম!! যিনি অন্যের মাগফিরাত ও ক্ষমালাভের মাধ্যম! আল্লাহর প্রেমে বিভোর এক বান্দা!

প্রকৃত পক্ষে এ-হুকুম তা'মিলের ধরন ও আকৃতি-যে কী, সে শুধু তাঁরাই জানতে পারেন, যাঁদের রয়েছে জানার যোগ্যতা। কিন্তু আমরা তো দেখি এর বাহ্যিক রূপ এরকমই ছিলো যে, সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় এবং তার মহিমা কীর্তনে বিভোর থেকেছেন। তাঁর ঠোঁটযুগল ছিলো সদা আল্লাহ্‌র তাসবিতে স্পন্দিত, তরতাজা।

ইস্তিগফার ও মাগফিরাত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে পয়গাম্বরকে। কিন্তু উদ্দেশ্যে উম্মত। বিজয় ও সাহায্য, আধিপত্য ও সাফল্য অর্জন উপলক্ষে রাসূলকে পর্যন্ত যেখানে মহিমা কীর্তন ও ক্ষমা চাওয়ার হুকুম করা হলো, সেখানে গোনাহগার উম্মতের বেলায় সে হুকুম পালন করা কী পরিমাণ জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

সত্যান্বেষীদের পথ

একটি পথ ছিলো এই। এ-ই ছিলো সত্যান্বেষীদের পথ। 'ছিলো' এ শুধু অতীতকাল সূচকই নয়, বর্তমানকাল সূচকও। এ-পথ যেমন খোলা ছিলো আগে, খোলা আছে আজো। খোলা থাকবে চিরকাল। হক ও সত্যের আরাধনা কখনো ব্যর্থ হয় না। যায় না কোনোদিন বিফলে। কারণ এই আরাধনা কেন্দ্রীভূত শুধু চিরআরাধ্য বিশ্ব প্রভুর ভিতরেই। তাই এ-পথের মঞ্জিলগুলো যতো বন্ধুর ও দুস্তরই হোক, এ-পথের পরীক্ষা ও মুসিবত যতো কঠিনই হোক, শেষ পর্যন্ত বিজয় আসে এ-পথেই। সফলতা ও মুক্তি তো সত্যান্বেষীদেরই ন্যায্য পাওনা! আল-কুরআন ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত কোনো গ্রন্থ নয়। হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা দেয়ার এক কার্যকর নুসখা—ব্যবস্থাপত্র। দুনিয়ার সমস্ত সত্যান্বেষীদের সরদারদের কাহিনী শুনিয়ে এ-কথাই তাতে বলা হয়েছে যে, সত্যের উপর চলে যারা, তাদের তকদিরের চিত্র ও নকশা হবে এমন—

প্রথমে পেরুতে হবে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতম ধাপ।

পরে আসবে বিজয় ও সাফল্য। স্বস্তির-শান্তির-প্রশান্তির সোনালী দিন!

প্রথমে কাটাতে হবে সহায়-সম্বলহীন দুর্বল জীবন।

তারপর আসবে শক্তি, ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য।

প্রথমে থাকবে অসহায়ত্ব ও সাজ-সরঞ্জামের তীব্র সংকট ও শূন্যতা।

পরে আসবে বিজয় ও সাফল্য।

প্রথমে হিজরত। পরে শুরু হবে বিজয় ও সাহায্যের ধারাবাহিকতায় নুসরত। শর্ত শুধু একটি-ই—

হেরার রাজ-তোরণ থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না।

বিপদ ও অসহায়ত্বের কঠিনতম মুহূর্তেও —لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا—

দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন— এ-কথা অকপটে আবৃত্তি করতে পারে— এমন একটি মহা শক্তির সাহচর্য ও সহযোগিতা হাত-ছাড়া করা যাবে না, যাবেই না। কক্‌খনো না!

অহংকারী ও দাম্ভিকদের পথ

কিন্তু দুনিয়াতে এই একটি পথই নয়, ঠিক তার বিপরীতে আরো একটি পথ আছে, সে পথ জাগতিক শক্তির পথ। অহংকারী ও দাম্ভিকদের পথ। এখানে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল, অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ব্যঙ্গ করা হয়। হাসি-উল্লাসের বিকৃত ধ্বনি তুলে বিদ্রূপ করা হয়। এখানে বিশ্বাস করা হয় শুধু নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর। তাই এ-পথ অহংকারের। এ-পথ দৌলত ও সাম্রাজ্যের। এ-পথ তাদের, সম্মান ও বিত্ত যাদের সর্বশেষ চাওয়া-পাওয়া, জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য। এখানে যখন সফলতা আসে, তখন এ-সফলতাকে মনে করা হয় বিষয় বৈভব, সংঘবদ্ধতা, সুচারুব্যবস্থাপনা এবং সভ্য দুনিয়ার সভ্য ভাষায় 'ক্যানভাসিং' (Convasing)-এর পরিণাম—ফল। সর্বপ্রকার আলো-ই তার বিপরীতে ঠিক ঐ পরিমাণ অন্ধকারকেই চায়। মক্কার এতিম, যাঁকে সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের আধার রূপে, নূর ও জ্যোতির মূর্ত প্রতীকরূপে পাঠানো হয়েছে তাঁর মুকাবিলায় যারা অমঙ্গল ও অকল্যাণের আধাররূপে এবং মূর্তিমান আঁধাররূপে সামনে এসেছিলো, তারা বংশগত দিক থেকে অপর কেউ ছিলো না। শীর্ষভাগে যে ছিলো, সে অন্যদের তুলনায় খুব কাছের মানুষ ছিলো। তাঁর আপন পিতৃব্য। মক্কার এক বিশিষ্ট নেতা ও সরদার। শুধু পার্থিব নেতৃত্ব নয়, সেকালের ধর্মীয় নেতৃত্বের আসনেও সমাসীন। একদিকে মক্কার 'লিডারশীপ' (Leadership) সম্পূর্ণ তার কব্জায়। অপরদিকে সে কাবাঘরের মুতাওয়াল্লী। আর তার সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে

তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ দিকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাফা পর্বতের টিলায় চড়ে যখন শোনালেন আপনজনকে, প্রিয়জনকে তাঁর পয়গাম, তখন ইসলামের এই চিরশত্রু হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বলেছিলো ঃ 'মুহাম্মদ! ধ্বংস হও তুমি! শুধু এজন্যেই আমাদের ডেকেছিলে।

তারপর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে তার বাধা প্রদান— সত্যের পথে। ন্যায়ের পথে। যে দিকেই সত্যের সৈনিক দাওয়াতের কাজে মনোনিবেশ করতেন, সে দিকেই এ-দুশমন নিজের সর্বশক্তি নিয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। হক ও বাতিলের সংঘাত এখন চূড়ান্ত পর্বে। চারদিকে বাতিলের সাজসাজ রব দেখে মনে হচ্ছিল, এরাই বুঝি শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে। ঠিক তখনই, যখন হকের বাণী কোণ্ঠাসা হয়ে নীরবে-নিভৃতে কাঁদছিলো, হকের ধারক বাহকদের যখন মনে হচ্ছিলো তাদের পৃথিবী বুঝি সংকুচিত হয়ে এসেছে, তখনই ঘোষণা হলো—

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ.

'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, আর ধ্বংস হোক সে নিজে।'

-লাহাব: ১

শত্রুতার দাবানলে ঠাসা— সত্যের এই তীব্র বিরুদ্ধাচারণকারী, যে নিজের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে এ-দুনিয়াতেই 'আবু লাহাব' (প্রজ্বলিত অঙ্গারের ধারক) নামে পরিচিত হয়েছে, সে আর বেঁচে নেই। চিরতরে নিপাত গেছে। ধ্বংস হয়েছে তার দু'হাত। যে-হাত দু'টি সত্যের বিরুদ্ধে সদা তৎপর থাকতো এবং নাচানাচি করতো, তা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে তার কুটিল ষড়যন্ত্র। নীল চক্রান্ত। তার 'পার্টি' ও 'কনফারেন্স' তার কোনো কাজে এলো না। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তার দম্ভ ও দর্পের হাঁকডাক। তার 'প্রোপাগান্ডা' ও নিন্দাবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারই নিস্প্রাণ বিকৃত মুখে। তার বিষয়-বৈভব ও জাত্যাভিমানের মিথ্যা অহংকার ধুলোয় মিশে গেছে। তার ধন-সম্পদ তাকে বাঁচাতে পারে নি।

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.

'কোনো কাজে আসে নি তার ধন দৌলত যা সে উপার্জন করেছে'।

- লাহাব: ২

বাঁচাতে পারে নি তাকে অনিবার্য পরিণামের হাত থেকে। সে আজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অকৃতকার্য তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা। লাঞ্ছিত ও ধিকৃত তার সব চেষ্টা ও সাধনা।

আবু লাহাবের পরাজয়— তকদিরের অমোঘ বিধান

এ-ভবিষ্যদ্বাণী কোনো কল্পনা-বিলাস ছিলো না। এ ছিলো তকদিরের লিপিকারেরই ফায়সালা। যা সত্যে পরিণত হয়েছিলো অক্ষরে অক্ষরে— বর্ণে বর্ণে। কয়েক বছরের ব্যবধানে শুধু আসমানের নূরানী ফেরেশতাকুলই নয়, পৃথিবীর মানুষও প্রত্যক্ষ করলো যে, মক্কার এই 'ভাগ্যবান' দলপতি, এ-'খোশনসীব' আমির ইসলামের বিরুদ্ধে গৃহীত নিজের প্রতিটি পদক্ষেপেই পরাজিত ও অকৃতকার্য হয়েছে। প্রতিটি ব্যাপারেই সে হয়েছে ব্যর্থ ও বিফল-মনোরথ। শোকোচ্ছ্বাস ঘেরা একটা ঘরে অতি মারাত্মক এক চর্ম রোগে সে আক্রান্ত। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ পাশে নেই— একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। ছটছট করছে মৃত্যু শয্যায় সে একা। নিঃসঙ্গ অবস্থায়। পায়ের অগ্রভাগ রগড়ে-রগড়ে .. ঘষে-ঘষে পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সাথে। মৃত্যুর পর দেহ যখন একেবারে বিকৃত হয়ে গেলো, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখন এক হাবশী গোলাম তার কাফনবিহীন শবদেহটা টেনে-হেচঁড়ে একটা গাতায় নিয়ে ফেলে দিলো। আর এ-সব ঘটে যায় ঠিক ঐ মুহূর্তে, যখন মক্কার সহায়-সম্বলহীন সেই এতিম বদর প্রান্তরে আবু জেহেলসহ মুশরিক বাহিনীর বাঘা-বাঘা নেতাতের জীবন বিনাশ করে, প্রাণোৎসর্গকারী ও নিবেদিতপ্রাণ একদল মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বীরোচিত পদক্ষেপে রাজকীয় জাঁকজমক সহকারে মদীনা অভ্যন্তরে—হাজারো জীবনোৎসর্গপ্রয়াসী জনতার আবাসভূমিতে প্রবেশ করছিলেন।

সাড়ে তেরশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ('হিজরতের বছর গণনা আবু লাহাবের অত্যাচার অনাচারের ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়') দীনদারীকে নয়, ইতিহাসকেই জিজ্ঞাসা করছি—

'আবু লাহাবের শান-শওকত আজ কোথায়?

কার মুখে উচ্চারিত হয় তার নাম?

পৃথিবীর কোন্ কোণে বেঁচে আছে তার বংশধর?

তার মৃত্যুশোকে কে বিসর্জন দিয়েছে ক' ফোঁটা শোকাশ্রু—
এমন মানুষ কি এ-পৃথিবীতে দু' একজন খুঁজে পাওয়া যাবে?
তার কবরের চিহ্ন 'প্রাচীন নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ বিভাগ' অনুসন্ধান চালিয়ে কি বের করতে পেরেছে?
এই ছিলো পৃথিবীতে তার পরিণতির দাস্তান। পরকালের পরিণতির কথাও শুনবেন একটু?

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.

'সত্ত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, সে ইন্ধন বহন কারিনী, তার গলদেশে খেজুরের ছাল-বাকলের রশি'। -লাহাব: ৩-৫

এখানে—এ পৃথিবীতে কিই-বা হয়েছে? এ তো সেই চিরকালীন ব্যর্থতার এবং সার্বক্ষণিক লোকসানের একটি সামান্য মাত্র নমুনা। যা সামনে ঘটতে যাচ্ছে তা এখন সন্নিকট। অত্যাসন্ন। যখন এই নরাধমের ভিতরের আগুন ওকে বাইরে থেকেও গ্রাস করে নেবে এবং সে নিক্ষেপিত হবে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায়, তখন তার দল, তার 'পার্টি', তার সমাজ, যারা এ পৃথিবীতেই তাকে বাঁচাতে পারলো না— ওখানে কী কাজে আসবে?

আর সে সেখানে—সেই জাহান্নামে নিঃসঙ্গ হবে না। পাশে থাকবে তার আদুরী জীবন সঙ্গিনী! 'ফার্স্টলেডী'!! সেই 'ফার্স্টলেডি'র প্রশংসিত গুণেরও বাহার দেখুন। দুনিয়াতে এর কথা ওর কাছে, ওর কথা এর কাছে লাগিয়ে-লাগিয়ে সে হৃদয়ে-হৃদয়ে সৃষ্টি করতো জিঘাংসা ও শত্রুতা। মু'মিনের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। সেখানে তার এসব সুকর্ম (?) (Gossip Gossing) কোনো কাজে আসবে না। আজ এ-মহিলা নিজের মহা মূল্যবান অলংকার নিয়ে গর্ব করে। তার সোনার কণ্ঠহার আল্লাহ্‌র পেয়ারা বান্দাহগণের বিরুদ্ধে ব্যয় করতে চায়। কিন্তু কেয়ামতের দিন তাকেই মোটা রশি দিয়ে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামের আগুনে। পৃথিবীতে যারা সত্যের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চেয়েছে তাদের পরিণতি এমনই হয়েছে।

এই হলো দু'টি পথ। এক পথে অগ্রসর হলে নজরে পড়ে কেবল বিজয় আর বিজয়, সাহায্যের পর সাহায্য এবং দয়া ও অনুগ্রহের বসন্ত বিরাজিত হৃদয় কাড়া দৃশ্যাবলী।

আর দ্বিতীয় পথটি দিক চিহ্নহীন হয়ে দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যায় ধ্বংস, বঞ্চনা ও লোকসানের অনিবার্য পরিণামের হাত ধরে।

প্রথম পথ— আত্মসমর্পণের পথ।

দ্বিতীয় পথ— অহংকারের পথ।

প্রথম পথ— আল্লাহ্‌র মকবুল ও প্রিয় বান্দাহগণের, বিনম্রচিত্ত দাসদের।

দ্বিতীয় পথ— স্বেচ্ছাচারীদের, প্রবৃত্তি পূজারীদের। বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের। তাদের, যারা গর্ব করে নিজেদের তথাকথিত জ্ঞান-বুদ্ধি, পরিকল্পিত পদক্ষেপ ও সুচারু ব্যবস্থাপনার!

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আরেকটির পরিপন্থী—সম্পূর্ণ উল্টো।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

'আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি'।

রাসূলের আলোচনার সমুচ্চতা

দিবাকর তুল্য খাদেমদের গর্বের পুঁজি

কোটি কোটি না হলেও লাখ লাখ এমন মানুষ নিশ্চিত পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের নাজাত, মুক্তি ও পরকালিন সৌভাগ্য জুড়ে রেখেছে আব্দুল কাদির জিলানীর সঙ্গে। আর এ শুধু আজ-কালের কথা নয়, শত শত বছর ধরেই চলে আসছে এ-ধারণা—অন্ধ বিশ্বাস। সঠিক ও ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের পর্যালোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু পাঠকের সামনে বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা। তাদের মুখে কারো নাম উচ্চারিত হলে, হয় গাউসুল আ'জমের নাম। আর কারো প্রতি ভরসা ও বিশ্বাস থাকলে তিনি 'মাহবুবে সোবহানী'। কিন্তু একটু ভেবে-চিন্তে বলুন তো, খোদ আব্দুল কাদির জিলানী এবং তাঁর সকল পূর্বসুরী ও উত্তরসুরীর ভিতর হাসান বসরী, জুনাইদ বাগদাদী, খাজা আজমিরী, সাইয়্যিদ আহমদ সারহান্দী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, নিজামুদ্দীন ও আলাউদ্দিন সাবির কালীরী— এরা সকলে কার নামে গর্ব করে? নিজের যশ ও খ্যাতিতে, না মরু-আরবের উম্মী নবীর গোলামী এবং মক্কার এতিমের নির্দেশ পালনে?

আল্লাহু আকবার! যাঁরা লাখো মানুষের সরদার এবং কোটি কোটি মানুষের ইমাম ও পথিকৃত, তাঁরা যদি কোনো কারণে নিজেদেরকে গৌরবান্বিতবোধ করেন, তাহলে তা শুধু এ জন্যে যে, তাঁরা রওজা শরীফের একজন ঝাড়ুদার, অন্য কিছু নয়!! আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কতো বড় বড় সাধু-সন্যাসী, ধর্ম-যাজক ও আধ্যাত্মিক নেতা জন্মেছেন, এই সম্মান ও মর্যাদা অন্য কেউ কি লাভ করতে পেরেছেন? অন্যদের খাদেম-ভক্ত-সেবকদের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে কি এমন অসংখ্য রবি-শশী-গ্রহ-তারা?

অতুলনীয় খেদমত ..

অতুলনীয় খাদেম ..

ইমাম বুখারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কে না জানে? তাঁর হাদীস-অনুসন্ধিৎসা, তাঁর গবেষণা এবং তাঁর বাস্তবতা বিশ্লেষণের নজির অন্য কোনো জাতির মধ্যে মিলবে কি? তিনি এবং তাঁর সহযাত্রী ও অনুগামী ইমাম মালিক, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ কোন্ কাজে সারা জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হয়েছিলেন? শুধু এক উম্মীর কণ্ঠ নি:সৃত বাণী, তাঁর জীবন-কথা ও কর্ম-বৃত্তান্ত জমা করার জন্যে নয় কি?

ইবনে হাজার আসকালানী, আয়নী, কাসতালানী, তীবী, সাখাভী, কাযী শওকানী, ইমাম নববী এবং তাদের মতো অন্যান্যরা কোন্ কাজে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন নিজেদের জীবন? সেই উম্মী নবীর বাণী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পেছনে! তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দমালাকে নির্ভেজাল প্রমাণের সাধনায়!!

ইবনুল জাওযী, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম সারা জীবন গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের সামনে নবী-জীবনের প্রতিটি দিক ও ক্ষেত্রকে স্বচ্ছ, পরিস্কার ও প্রস্ফুটিত করে তুলে ধরেছেন। সাফ বলে দিয়েছেন— নবীজীর নামের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন্ কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট এবং কোন্ কোন্ বিদ'আত তাঁর সুন্নত ও অনুসৃত নীতির সাথে সম্পর্কহীন। এইসব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তারা অপরিসীম সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

এ-পৃথিবীতে জন্মেছেন কতো বড় বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, দক্ষ শিল্পী ও প্রকৌশলী। কিন্তু পৃথিবী কি তাদের প্রতি এর অর্ধেক গুরুত্বও প্রদর্শন করেছে? কোন্ প্লেটো, কোন্ এরিষ্টাটল, কোন্ সক্রেটিস, কোন্ নিউটন, কোন্ কেণ্ট ও কোন্ ডারউইনের কথামালা ও শব্দচিত্রকে এই পরিমাণ যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান-গবেষণার পর জমা করা হয়েছে? কার একেকটি কথা, একেকটি শব্দ এতো বাছ-বিচারের পর একদল পবিত্র মানুষের মাধ্যমে এবং আরেকদল সত্যবাদী মানুষের সাক্ষ্য-সজ্জিত করে এমন সন্দেহাতীত ও পর্যায়ক্রমিক ধারায় কাগজের বুকে সংরক্ষণ করা হয়েছে?

জীবন-বৃত্তান্ত সংরক্ষণ

ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, সুহায়লী, যারকানী, ইবনে সা'দ, কাযী আয়ায, দিমইয়াতি, মোগলতায়ী ও তাঁদের শাগরিদ ও সমসাময়িকদের রচিত বৃহৎ কলেবরের বহু খণ্ডে বিভক্ত কিতাবগুলোর কথা আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে। কী ছিলো এঁদের জীবনের মহান ব্রত? কোন্ জিনিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এঁদের দিবস-রজনী ও সকাল-সন্ধ্যা? সেই উম্মী নবীর জীবন-বৃত্তান্তের একেকটি দিক সংরক্ষণ এবং তাঁর জীবন চরিতের একেকটি লাইন মুখস্থ করার কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস সাধনায়!! শুধু এঁরাই কেনো? মুক্ত চিন্তার অধিকারী ও বিদ্যানুরাগী মূর ও মারগুলিয়াস, বিশিষ্ট গবেষক কারলাইল (Karlyle) ও বাস্তব চিন্তার অধিকারী ওয়েলহাউসেন (Wellhousen) কে তাঁর জীবন চরিতকারদের কাতারে গণ্য হওয়ার বাসনায় কে ব্যাকুল ও অস্থির করে তুলেছিলো?

পৃথিবীতে কতো বড় বড় রাজা-বাদশাহ এবং মুকুটধারী সম্রাট জন্মেছেন, কিন্তু কই; কারো জীবন-চরিতকে এমন সীমাহীন যাচাই-বাছাই ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে তো সংরক্ষণ করা হয় নি! কোন্ ফেরাউন, কোন্ নেপোলিয়ন, কোন্ আলেকজান্ডার, কোন্ জার, কোন্ দারা, কোন্ কায়সার, কোন্ ফাগফূর, কোন্ রাজা-বাদশাহ ও মহারাজার প্রতিটি চাল-চলন, অঙ্গ-ভঙ্গি, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগৃতি, হাসি-কান্না, সবাক-নির্বাক-অবস্থা ও পানাহারের বিশদ বর্ণনা এ রকম সীমাহীন যাচাই-বাছাই এবং নজিরবিহীন গুরুত্ব ও বিশ্বস্ততার সাথে কাগজের পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়ে এসেছে আজ অবধি?!

উম্মী নবীর শরীয়তের ব্যাখ্যাতা, তার বিশালতা ঃ

ইমাম আবু হানীফার নাম উচ্চারিত হয় শিশু কিশোরদের কচি মুখেও। এমন কোনো হৃদয় আছে, যা তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, শ্রদ্ধাবোধ থেকে শূন্য? তাঁর কথা না হয় থাকলোই। তাঁর শাগরিদ বরং শাগরিদের শাগরিদের উঁচু মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভের কথাই একটু ভাবুন না! সমসাময়িকরা তাঁদেরকে স্বীয় যুগের ইমাম হিসাবে বরণ করেছিলেন। কিন্তু খোদ এই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁদের সাথী-সঙ্গী ও শাগরিদ— সুফিয়ান

সাওরী, আওযায়ী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, হাসান, হাম্মাদ মুযানী, তাহাভী ও সারাখসীসহ হাজার হাজার ফিকাহবিদ —যাঁরা এ পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেছেন— সবাই মিলে কী করেছেন এঁরা? সেই বর্ণ-জ্ঞানহীন উম্মী নবীর আনীত ধর্মের কানুন ও মূলনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন! তাঁর বাতানো শরীয়তের আমল সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সঠিক ও সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করেছেন এবং ইজতিহাদ করে উদ্ভাবন করেছেন নতুন নতুন মাসআলা। কিন্তু পৃথিবীতে তো আরো বড় বড় আমীর-উমারা, উযির-নাজির, আইনজ্ঞ, রাজ্যপাল, দেশ পরিচালক ও রাষ্ট্রপতি অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের ভাগ্যে কি এমন অসংখ্য ব্যাখ্যাতা জুটেছে? গ্রীস, হিন্দুস্তান, মিসর ইত্যাদির কথা বাদই দেয়া যাক। রোমের কথাই ধরুন, সেখানকার প্রণীত বিধান ও আইন-কানুন —আল্লাহই ভালো জানেন— ক'জনকে প্রভাবিত ও বিস্মিত করেছে! কিন্তু 'ইসলামিক ল'র যে বিস্তৃতি ও বিশালতা রয়েছে তার এক দশমাংশও কি 'রোমান ল'র আছে?

রাসূলের স্তুতিগান গেয়েছেন যাঁরা

আল্লামা রুমীর মসনবী শরীফ আজো কতো হৃদয়কে করে ব্যাকুল— মাতোয়ারা!! কতো মাহফিলকে করে তোলে প্রাণবন্ত—সজীব!! কিন্তু মাওলানা রুমী, মহাকবি হাফিজ, সাদী, নিজামী, খসরু, আল্লামা জামী, সানায়ী ও আত্তার শত বছর ধরে কার স্তুতিগান গেয়ে গেছেন? কার বার্তা বাহক ছিলেন তাঁরা?

কোন্ বড় ও মহানকে কেন্দ্র করে তাঁরাও হয়ে গেলেন বড় ও মহান? সেই মরু-আরবের এক চাটাইয়ে-বসা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই নয় কি?! যিনি কোনো ছন্দবদ্ধ কবিতা সম্ভবতঃ পড়তেও জানতেন না! তাঁর জন্যে কবিতা কোনো গৌরবের বিষয়ও ছিলো না বরং আল কুরআনে তাঁর জন্যে কবিতাকে অসমীচীন আখ্যা দেয়া হয়েছে।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ..

'আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দিই নি, আর তার জন্যে তা সমীচীনও নয়'।

-ইয়াসিন: ৬৯

পৃথিবীর বড় বড় খ্যাতিমান কবিরা আজ পর্যন্ত আর কাকে এমনভাবে কবিতার ছন্দে-ছন্দে .. ছত্রে-ছত্রে সংবর্ধনা জানিয়েছে? কবিতার স্বচ্ছ-সলীল সরোবরে আবেগভরে সাঁতার কেটেছে?!

কোন্ যুগের কোন্ কবি কোন্ বাদশাহর শানে এমন নজিরবিহীন আন্তরিকতা, এমন নিষ্ঠা ও বিগলিতচিত্ত নিয়ে কবিতা লিখেছে এমন করে তাঁর প্রশস্তি গেয়ে-গেয়ে?! কাকে ডেকেছে অমন ব্যাকুল হয়ে?!

হোমার, ইমরুল কায়েস, ফিরদৌসী, বাল্মিকী, শেক্সপিয়র, মিল্টন, গ্যাটে, কালিদাস এবং এদের কাতারের কোন্ কালের কোন্ কবির বাণী ও পয়গাম লাভ করতে পেরেছে এ-গ্রহণযোগ্যতা ও এ-মর্যাদার অর্ধেক, অর্ধেকের অর্ধেক কিংবা দশ ভাগের এক ভাগ?!

কোন্ প্রদীপের পতঙ্গ ছিলেন তাঁরা?

উমর ফারুক, আলী মুরতাজার নামে কতো বাহাদুর মায়ের কলিজা কেঁপে কেঁপে উঠে! খালিদ সাইফুল্লাহর তলোয়ার, আমর ইবনুল আসের সুদক্ষ রাজ্যপরিচালনা ও কর্মপন্থা পাথরকেও কি পানি করে প্রবাহিত করে নি? তাঁরা কোন্ প্রদীপের পতঙ্গ ছিলেন? তাঁরা কার সামনে বিনয়াবনত হয়ে, নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সম্মান ও মর্যাদার এই উচ্চাসনে? হারুন রশীদ, মামুন রশীদ, সালজুক, দায়লাম, গযনভী, ঘোরী, তাইমূর, বায়েজীদ, উসমান, সালীম, তারিক, কাসিম, লোদী, খিলজী, বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, ও আওরঙ্গজেব কার পদধুলিতে সর্বক্ষণ চুমু খাওয়াকে নিজেদের জন্যে উন্নতির সোপান ও মুক্তির পথ মনে করতেন? দাক্ষিণাত্যের বর্তমান অধিপতি কার প্রতি সীমাহীন অনুরাগ ও ব্যাকুলতায় কেঁদে কেঁদে সারা?! সহায়-সম্বলহীনেরা কার দীনের সম্মানার্থে স্পেন ও ফ্রান্সের মতো বিশাল দু'টি সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে একটু ভেবে পর্যন্ত দেখে নি? কার উম্মতের জন্যে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন আনোয়ার পাশা? কাঁর নামের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় জিহাদে জীবন দিলেন সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী? কাঁর উম্মতের চিন্তায় নির্বাসিত হলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী, তারপর নজরবন্দী? কেনো বেছে নিলেন কয়েক বছরের কারা জীবন?

কাঁর বার্তা বহন করছে বে-নজির ইলমে কালাম ও ইলাহী দর্শন?

ইমাম গাযালীর রচনাবলী নিয়ে আমরা গর্ব করি দিন-রাত—সর্বক্ষণ। কিন্তু একজন অমুসলিমও যে আমাদেরই মতো গর্ব করতে পারেন, তার নমুনা দেখুন। 'তারীখে ফালসাফা' রচয়িতা জর্জ হেনরী ইয়েটস বলেন, 'ডেকার্টের সময়কাল পর্যন্ত যদি গাযালীর রচনাবলীর তরজমা হয়ে যেতো, তাহলে লোকেরা ডেকার্টের দর্শনকে গাযালীর দর্শন থেকে চুরি-করা একটি অংশই মনে করে বসতো।'

ইমাম গাযালী এবং তাঁর অনুসারী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভী, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীসহ অন্যান্যরা উম্মতের কাছে দীনের অন্তর্নিহিত নিগূঢ়তর রহস্যাবলীর ব্যাখ্যা এবং রূহানী ব্যাধির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে এই-যে রচনা করে গেছেন হাজারো কিতাব, এ-সবের খোলাসা ও সারনির্যাস আসলে কী? একটি-ই! সেই উম্মী নবীর আনীত দীনের বিস্তৃতি সাধন, তার প্রচার-প্রসার, তার সার্বিক সংরক্ষণ। আবুল হাসান আশআরী, আবু বকর বাকিল্লানী, ইমাম রাযী, আমুদী, নাসাফী ও জুরজানী— আকায়েদ ও দর্শন বিষয়ক যে অমূল্য গ্রন্থমালার বিপুল ভাণ্ডার সঞ্চিত করে গেলেন এবং তাদের সুযোগ্য উত্তরসুরীরা যেভাবে প্রত্যেক যুগে জন্ম গ্রহণ করে চলেছেন এবং আজ এই হিজরী চৌদ্দশতকের মাঝামাঝিতেও যে ধারায় কাজ অগ্রসর হচ্ছে, এই মানের ও এই পরিমাণের দর্শন কার মহান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে? ইতিহাসখ্যাত কোন্ সে দিকপাল ও মহামনীষী এমন বিশাল বিস্তৃত পরিসরের দর্শন-সাহিত্য জন্ম দিতে পেরেছেন?

আবার আসুন তাফসীরের ময়দানে!

তাফসীরশাস্ত্রবিদগণের নাম এবং তাঁদের মহান কীর্তি ও অবদান কার সামনে আলোকোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় নয়? তাবেঈদের ভিতর যাহ্হাক, কাতাদাহ্, মুজাহিদ ও ইবনে যায়দ তাফসীরে কুরআনের যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন— কে দিতে পারবে তার 'দাদ'—প্রতিদান? ইবনে জারীরের ত্রিশ খণ্ড তাফসীরের কথা কেউ কি ভুলতে পারবে? কে দিতে পারবে ইবনে কাসীরের অনুসন্ধান ও গবেষণার বিনিময়? বায়যাভী ও যামাখশারীর প্রতি সম্মান থেকে কোন্ হৃদয় শূন্য, শুনি? বাগাভী ও নাসাফী,

ইবনে হিব্বান ও আবু সঊদ কিসের খেদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন গোটা জীবন?

কল্পনার চোখ দেখতে পাচ্ছে— এঁরা সকলেই বহু খণ্ডে বিভক্ত নিজেদের 'তাফসীর গ্রন্থ' নিয়ে বিনয়াবনত হয়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই উম্মী নবীর খিদমতে! কেবল তাঁর একটু মায়াভরা-স্নেহভরা-প্রেমময় দৃষ্টি লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষায়! নবীর পায়ের তলায় নিজেদের জীবন কুরবান করে দেয়াই ছিলো এঁদের ভাষাহীন দৃষ্টির সবচে' বড় আরযু ও তামান্না!!

ব্যাকরণ ও ভাষা ঃ নববী খিদমতের আরেকটি ছবি

দৃষ্টি ফেরান এবার ব্যাকরণ ও ভাষার দিকে। চোখের সামনে ভেসে উঠবে সে বিষয়ের উপর সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের ছবি। ব্যাকরণ আর ভাষা নিজেই বুঝি গর্ব করে এদেরকে নিয়ে! কিসাঈ, আবু'ল আসওয়াদ দুওয়ায়লী, খলীল সিবাওয়াইহ্‌, ইবনে মালিক, ইবনে হাজিব, ইবনে দুরায়দ, ইবনে মায়দা, যামাখশারী, মুতাররিযী, জাওহারী, ফীরূযাবাদী, ইবনে মনজুর ও জুনাইদী— এদের কারো প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো 'সরফ' (শব্দগঠন ও রূপান্তর) আর কারো 'নাহব' (বাক্য বিন্যাস ও ব্যবহার বিধি) আর কেউ বেছে নিয়েছিলেন অভিধান। এ-সবের অন্তরালে সবার মুখ্য উদ্দেশ্য আসলে কী ছিলো? একটি-ই! শুধুই একটি!! সেই উম্মী নবীর আনীত ও প্রদর্শিত দীনের খিদমত! পৃথিবীতে উম্মীদের, নিরক্ষরদের এমন মর্যাদা কি হাসিল হয়? হয়েছে কি কোনো দিন? বাদ দিন উম্মীদের কথা। ঘেঁটে দেখুন পৃথিবী বিখ্যাত বিদ্বানদের অতীত ইতিহাস! তাঁদের কারো ভাগ্যে কি এমন ব্যাখ্যাতা এবং এমন এমন খাদেম মিলেছে? আর বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্রের উপর যারা লিখেছেন তাঁদের ফিরিস্তি তো রয়েই গেলো!!

চিকিৎসক ও দার্শনিক

সবশেষে দার্শনিকদের কথায় আসুন। আর এমন জুড়িবিহীন, অনন্য ও বিরল দার্শনিক-প্রতিভা কার আছে? কার ছিলো? থামবেন না! উল্টে যান মুসলিম-ইতিহাসের পাতা— একের পর এক! দেখবেন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, তূসী, ফারাবী, রাযী ও সিরাজী–এরা সকলেই ছিলেন তাঁর কাছে বন্দি। সবার বিশ্বাস ও ভক্তির আঁচলই ছিলো তার জুতা মুবারকের ফিতার

সাথে সংযুক্ত! এই সংকুচিত পরিসরে কতো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়ের নামই আর গোনায় আনা যায়? জীবনের কোন্ কোন্ দিক ও ক্ষেত্রকে আলোর মুখোমুখি করা যায়? শক্তি, ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির বর্ণিল চিত্রাংকন আর কতো?! আর কতো পরিবেশন করা যায় খ্যাতিমানদের নাম, কীর্তি ও অবদান?!

جملہ ترکان ہند دے تو

দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো মুখর কার আলোচনায়?

মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্বাধীন ইসলামী দেশের দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, পরাধীন ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী— হিন্দুস্তান, যেখানকার[১] বাজারে 'আরবী মুদ্রা' অচল, সেই হিন্দুস্তানের বুকে এই নদওয়াতুল উলামা, দারুল উলুম দেওবন্দ কার নামের মহিমা কীর্তন করে চলেছে শতাব্দীকাল ধরে? দিল্লীর জামেআ মিল্লিয়্যা টিকে আছে কার উম্মতের খেদমতে? স্বাধীন ও মুক্তচিন্তা চর্চার দাবিদার হয়েও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কার দীন ও আইনের আনুগত্যের মাঝে খুঁজে পায় নিজের গর্ব ও অহংকার?

কোন্ দুঃসময়ে এলো সমুচ্চতার এই ঘোষণা?

হিন্দুস্তানের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, আরবের বালিয়াড়ি ও নির্জন মরু-প্রান্তরে, আফ্রিকার বন-বনানী ও মরু-বিয়াবানে এবং লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিনের মতো সভ্যতার লীলাভূমিতেও আজ প্রতিদিন একবার নয়, পাঁচবার আল্লাহ্‌র নামের সাথে কার নাম বুলন্দ আওয়াজে ধ্বনিত হয়ে চলেছে?!

আপনার নির্মল বিশ্বাস ও ভক্তির জগত থেকে 'ক্ষণিকের জন্যে' একটু সরে গিয়ে দূর হতে শুধু বাস্তব ঘটনাবলীর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই অবলোকন করে বলুন তো— এ-সম্মান ও মর্যাদা পৃথিবীর জানা-অজানা অনাবৃত প্রারম্ভিক ইতিহাস যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন্ 'হাদী' ও পথ প্রদর্শক, কোন্ রাহবার ও দিকপাল এবং অন্য কোন্ সৃষ্টির লাভ হয়েছে?

---

১. রচনাকাল ছিলো ভারতে বৃটিশ শাসনের যুগ।

যে-অসহায় এতিমকে দেয়া হয়েছিলো এই প্রতিশ্রুতি ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন বিপুল শক্তি ও ক্ষমতাধর কোরাইশ-নেতারা কল্পনায় তাঁকে পিষে একেবারে নিশ্চিহ্নই করে দিয়েছিলো। মুছে ফেলেছিলো তাঁর নাম নিশানা পর্যন্ত।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

'আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি'।

তাঁর কথা, তাঁর আলোচনা, তাঁর মাহাত্ম্য যদি সমুচ্চ না হয়, তাহলে হবে কার? তাঁর নাম চির উন্নত, চির অম্লান থাকবে না, তাহলে থাকবে কার? এই হলো আলোচনা সমুচ্চ হওয়ার সে তাফসীর ও ব্যাখ্যা যা সেই সাড়ে তেরশ বছর পূর্ব থেকেই লেখা হয়ে আসছে দিবস-রজনীর পাতায়। আর সময়ের পলকহীন দৃষ্টি তা পড়ে চলেছে কতোকাল ধরে! আল্লাহই জানেন, আর কতোকাল ব্যাপী পড়তে থাকবে এভাবে!!

রোয কেয়ামতে আল্লাহ্র কাছে তাঁর যে মর্যাদা হবে, তা তো হবেই। সে প্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শুধু তাঁর একটি মর্যাদার কথাই চিন্তা করুন, যা কেবল তাঁর আলোচনা সমুচ্চ হওয়ার কারণেই সেদিন তিনি লাভ করবেন। তাঁর কাছে মানুষ ছুটে আসবে দলে দলে।

এদিক থেকে আসছে রাজা-বাদশাহ্, আমির-উমারা, ওদিক থেকে আসছে নামকরা জেনারেল ও সিপাহসালাররা। একদিক থেকে এগিয়ে আসছেন মুহাদ্দেসীনে কিরাম দলে দলে, অপরদিক থেকে আসছেন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম, ফিকাহবিদ, উসূলবিদ (কুরআন হাদীসের আলোকে যাঁরা ইসলামী আইনের মূলনীতি স্থির করেন), আকায়েদের ইমাম, সুফী-সাধক, ভাষাবিদ, জীবন চরিতকার, রিজাল শাস্ত্রবিদ (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণকারী), ব্যাকরণবিদ, অলংকারবিদ, দার্শনিক, যুক্তিবিদ ও উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠিত এক মুবারক জামাত। যে বিষয়ের কথাই ধরুন, সে বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দেখবেন জোড় হাতে তাঁর পাশে জমায়েত হচ্ছে বিনয়াবনত দৃষ্টি নিয়ে!

শুধু এই নেয়ামত লাভের বিশাল বিস্তৃত পরিধির কথা কার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব?

সীরাতুন্নবী এবং প্রাচ্যবিদ্বানবর্গ

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে 'জর্জ ফিনলে' নামে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বৃটেনে জন্ম গ্রহণ করেন। জার্মানির 'গেটিনগান ইউনিভার্সিটি'তে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখান থেকে এম. এ. ও এল. এল. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো 'তারীখে ইউনান'—গ্রীক ইতিহাস। গ্রীক এবং গ্রীক সভ্যতার এ-গবেষক ১৮২৬ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ইংরেজী ও গ্রীক ভাষায় একগাদা গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা করে ফেলেছিলেন। ১৮৪৪ এর সময়কালে তাঁর একটি বই 'গ্রীসঃ রোমানদের শাসনামলে' (Grece under the Romans) এ-শিরোনামে প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে সে বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিলো। ইতিহাসের এ-লগ্নেই ইসলামের উন্মেষ ঘটে। নবীজীর উপর নাযিল হয় আসমানী ওহী। রোমানদের হুকুমত গ্রীস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। রোমের বিশালতার সামনে গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থা ছিলো একটি প্রদেশের মত। তাই সাহাবা-যুগে মুসলমান এবং রোমানদের ভিতর যে-সংমিশ্রণ ঘটেছিলো, তা ইউনান বা গ্রীসের মাধ্যমেই হয়েছিলো। এ-জন্যে উক্ত বইটিতে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর কথা অপরিহার্যভাবেই এসে গেছে। লেখক ইসলাম সম্পর্কে শত্রুভাবাপন্ন ও কট্টর— তা বলছি না। তাছাড়া ইসলামী শাসনামলেও রচিত হয়নি এ-গ্রন্থ। তবু তা জন্ম নিয়েছে একজন প্রাচ্যবিদের উর্বর চিন্তা-চেতনা থেকে। তাই সামনের পৃষ্ঠাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন— যে-সব প্রাচ্যবিদরা ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবাপন্ন নয়, তারাও কোনো-না-কোনো উপায়ে ঘটনার বাস্তবতাকে বিকৃত রূপ দিয়ে পরিবেশন করে থাকেন। আরো দেখবেন কি সন্তর্পণেই না তারা 'সীরাতে নববী' কে পর্যন্ত 'টার্গেট' বানিয়ে থাকেন।

দু'একজন মানুষের হিদায়াতকে কেন্দ্র করে কেনো এই প্রাণান্তকর কসরত?

আরব জগতে নবুওতের সূর্য উদিত হওয়ার প্রাক্কালে যে ম্লান ও ক্ষীণ আলোক রশ্মি কারো কারো নজরে পড়ে গিয়েছিলো তার চিত্র এঁকেছেন এই

ঐতিহাসিক। এঁকেছেন এমনভাবে যেনো আপনা থেকেই আরবদের ভিতরে আত্মসংশোধন ও আত্মসংস্কারের তীব্র বাসনা ও জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো।

'এটি লক্ষণীয় ব্যাপার যে, আরবরা ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের পুরোটা সময় ধরেই নিজেদের চারিত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং সভ্যতায় ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান হচ্ছিলো। তাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছিলো। শক্তিশালী প্রতিবেশীর অভাবে তাদের স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বও তাদের কাছে বেশ বেড়ে গিয়েছিলো। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কারণে নিজেদের গুরুত্বও তাদের কাছে অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। তাদের ভিতরে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো 'জাতীয় ঐক্যে'র ধ্যান-ধারণাও, যা তাদের ভিতর ইতিপূর্বে ছিলো না। সম্রাট হিরাক্লিয়াস ক্ষমতায় আসার আগের শতকে এ-সব কারণ পুরা আরব জাতির মধ্যেই বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আর এ বিষয়টি থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে নিলে চলবে না যে, মুহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করে ছিলেন 'দ্বিতীয় জাষ্টিনিয়ান-এর সময়কালে। আর জাতীয় পর্যায়ের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ধারায়ই তিনি প্রতিপালিত হন'।[১]

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এরচে' উৎকৃষ্ট নমুনা মেলাই মুশকিল। লেখকের সামনে ইসলামের নবীর বিস্ময়কর কামিয়াবী ও সাফল্য বাস্তব ঘটনার আকারে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার গুরুত্বকে খাটো করে পরিবেশন করার জন্যে তিনি বে-দিশা ও অস্থির হয়ে পড়লেন! এ কথা কেনো-যে তিনি বুঝতে পারলেন না যে, রাসূলের আবির্ভাবকে তিনি যে ভাবেই পেশ করুন— ধর্মীয় পোশাক পরিয়ে কিংবা রাজনৈতিক রঙ মিশিয়ে, বাধ্য হয়েই তিনি এমন কথা লিখে যান, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে নবীজীর আসল মিশন যেনো রাজনীতিই ছিলো। অর্থাৎ আরব গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের ভিতরে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। এই যদি হয় তার উদ্দেশ্য, তবে তিনি যেনো বিলীন হয়ে যান এমন উদ্দেশ্যের পেছনে!

তাওহিদের উপর এতো জোর দেয়ার কারণ?

উদ্দেশ্য যদি রাজনীতিই হবে, তাহলে তাওহিদের উপর জোর দেয়ার এতো কী প্রয়োজন ছিলো? কী দরকার ছিলো বাতিলের বুতখানা নিশ্চিহ্ন করে

১. অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৫, পৃষ্ঠা: ৩২২, ডভ এন্ডসন্স প্রকাশনী, লন্ডন

দেয়ার লক্ষ্যে এ-সব জিহাদ ও সংগ্রামের? বিশেষত আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিস্থাপন, ইবাদতের এ-সুনির্দ্ধারিত হুকুম-আহ্কাম ও বিধি-বিধান পেশ করার কী কারণ ছিলো? আসলে তাঁর উদ্দেশ্য-যে কী ছিলো, তা আল্লাহ্র উপর হাওয়ালা করা ছাড়া আমরা কোনো পথই দেখছি না। জর্জ ফিনলে সাহেব তো আবার একজন দূরদর্শী ঐতিহাসিক! আরব বিশ্বে ইসলামের আবির্ভাবের পুর্বেই যদি রাজনীতি ও জাতীয় ঐক্য বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করেছিলো, (যেমনটি তিনি বললেন) তাহলে কেনো তিনি দয়া করে সে বৈপ্লবিক কাফেলার বেশী না, মাত্র দু'চারজনের নাম হাতে গোনে আমাদেরকে বলে দিলেন না? অথবা ঐতিহাসিক সাহেবের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে শুধু ধর্মীয় সংশোধন ও সংস্কারের জন্যেই বয়ে গিয়েছিলো সে বিপ্লবের হাওয়া এবং নবুওত-পূর্ব কালেই স্থাপিত হয়েছিলো সে বিপ্লবের বুনিয়াদ, তাহলে একটু কষ্ট স্বীকার করে সে সময়ের সংস্কারসেবীদের কীর্তি ও কর্মধারা সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ভাষায় কেনো কিছু উল্লেখ করেন নি, যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, এই সীমারেখা পর্যন্ত আগে থেকেই কাজ সমাধা হয়েছিলো এবং ইসলাম যাত্রা শুরু করেছে এর পর থেকে? কিন্তু বিশ্বাস করুন, সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও ..তা চষে ফেলেও মাত্র এমন চারজন মানুষের নামই খুঁজে পাওয়া গেছে, যারা বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের প্রতিমাপূজার অসার ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে দীনে ইবরাহীমীর তালাশে দ্বারে-দ্বারে, দেশে-দেশে ঘুরে ফিরছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জন শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান হয়ে যায়। একজন শেষ পর্যন্ত ঘুরেই ফিরছিলো। শুধু চতুর্থ জনের ভাগ্যেই তাওহিদের উপর অটল থাকা সম্ভব হয়েছিলো। ড. সাহেব! এরই নাম কি পৃথিবীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন?! এ রকম হাতে-গোনা নগণ্য সংখ্যক হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষ কোন্ সম্প্রদায়ে কোন্ কালে ছিলো না?

এখন দেখার বিষয় শুধু এই যে, এই নগণ্য সংখ্যক মানুষের অথবা খৃষ্টান ধর্মের অথবা ইহুদী ধর্মের অথবা অন্য কোনো মাযহাবের সংস্কারধর্মী প্রভাব কি আরব জাতি আদৌ কবুল করেছিলো?

শুধু মুসলিম ইতিহাসবেত্তাগণই নয়, বরং খোদ স্যার উইলিয়াম মূর পর্যন্ত এর নেতিবাচক জওয়ার দিয়েছেন। তিনি লিখেন—

'মুহাম্মদের ছেলেবেলায় আরবের অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। সংস্কার ও সংশোধনের ব্যাপারে এমন হতাশাঘেরা অবস্থা বুঝি আগে আর ছিলো না।

কখনো কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তার অদ্ভুত অদ্ভুত জের ও কারণ তৈরী করা হতো। মুহাম্মদের আবির্ভাবের সাথে সাথে গোটা আরবে ছেয়ে গেলো এক নতুন ও উদ্দীপ্ত ঈমানী চেতনাবোধ। এ থেকে এই ফলাফল বের করা যে, আরবরা পূর্ব থেকেই একটা পরিবর্তনের জন্যে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে বসেছিলো এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলো সীমাহীন ব্যগ্র ও উদগ্রীব—এটা হবে ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[১]

সাজ-সরঞ্জামহীন মুসলিম বাহিনী এবং রোমানদের পরাজয়

ইসলামী ফওজের হাতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পরাজয় ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। একদিকে মওজুদ যুদ্ধের সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ও বিপুল আয়োজন। সেই সাথে বংশানুক্রমিক ধারায় চলতে থাকা যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতা, সমর-বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রাচুর্যের সম্মিলন এবং অগণিত সৈন্য-সামন্ত। অন্যদিকে সৈন্য সংখ্যা একেবারেই নগণ্য, অতি সাধারণ ধরনের কিছু যুদ্ধাস্ত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুমুখী শিক্ষার অভাব এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের তীব্র সংকট ও অনুপস্থিতি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, কামিয়াবী ও গৌরবদীপ্ত সফলতা অর্জিত হয় এই দ্বিতীয় দলের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবেই মুসলিম বাহিনী এবং রোমান বাহিনীর জয়-পরাজয়ের চিত্র অংকিত হয়েছে নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহে এভাবে—

'যেখানে একদিকে সম্রাট হিরাক্লিয়াস চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যেনো প্রাচ্য দুনিয়ার হৃত শান-শওকত আবার ফিরে আসে। পাশাপাশি ধর্মীয় ঐক্যের অভিলাষ তার চিন্তা-চেতনায় শিকড় বিছিয়ে বসলো, যা সব সময় মানুষের জন্যে এক মারাত্মক ও বিপদজ্জনক ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। অপরদিকে মুহাম্মদ তাওহিদের প্রতি মানুষের আবেগ-অনুভুতিকে পুঁজি করে আরব বিশ্বকে একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার এবং দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একটিমাত্র ধর্মে দীক্ষিত করার সফলতা হাসিল করে ফেললেন'।[২] (সুবহানাল্লাহ! ইতিহাস চর্চা কয় কারে।)

হিরাক্লিয়াস এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের মুকুট-সম্রাট। যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে তার বংশের শাসন। তার ভাণ্ডারে পড়ে আছে বিপুল রত্নরাজি। তার

---

১. ভূমিকা, সীরাতে মুহাম্মদী, অধ্যায়-২ পৃষ্ঠা-৯৬-৭, প্রকাশনী জন গ্রান্ট এডেনবরা

২. পৃষ্ঠা-৩৪১--৩৪২

চার পাশে সর্বক্ষণ হাজির থাকে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। ঐক্যের জন্যে তার সকল চেষ্টা-তদবিরই ব্যর্থ হয়ে যায় আর এ-ব্যর্থতার দায় চাপানো হচ্ছে ধর্মীয় ঐক্যের অভিলাষের উপর এবং তাকে এক বিপজ্জনক ও মারাত্মক ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন আরব পল্লীর এক উম্মী সহায়-সম্বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই যখন সংগ্রাম করে-করে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে দেশের পর দেশ জুড়ে বদলে দেন দৃশ্যপট এবং সবার হৃদয়ের গভীরের বিশ্বাস ও অনুভূতিতেই শুধু নয়, বরং বাস্তব জীবনের বাঁকে-বাঁকেও সাধন করেন আমূল পরিবর্তন, তখন এ-প্রেক্ষাপট বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো রকম গায়বী নুসরাত ও অদৃশ্য সাহায্যের বিষয়টি ইশারা-ইঙ্গিতেও স্বীকার না-করে এবং ফেরেশতা কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টিকেও সযত্নে ও অতি সন্তর্পণে পাশ কেটে গিয়ে শুধু এই বলে মনকে প্রবোধ দেয়া যে, 'মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে তাঁর সঠিক ধারণা ছিলো'! একেই কি বলে ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ? এই কি তাহলে গবেষণামূলক প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বাস্তবরূপ?! মা'আযাল্লাহ্—হে আল্লাহ! তোমার আশ্রয় চাই!

ভাওতাবাজি বলে কাকে

ইসলাম এবং ইসলামের নবী সম্পর্কে ইউরোপ-যে পূর্ণ প্রতারণার শিকার, উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ তার চমৎকার নমুনা। লেখক কোনো পাদ্রী নন। খৃষ্টান ধর্মের তার্কিকও নন। তিনি একজন ঐতিহাসিক। বিদগ্ধ লেখক। তাঁর লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার খণ্ডনও নয়— বরং 'গ্রীক ইতিহাস'। ইসলাম এবং ইসলামের নবীর কথা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসাবেই এসে পড়েছে। কিন্তু বেচারা পাঠক তা পড়ছে মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত মন নিয়ে। তার পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ কখনো এসে পড়ে ইসলামের নবীর কথা। প্রকাশ্য কোনো নিন্দা, কটাক্ষপাত, সমালোচনা ও অপমানের ভাষায়ও নয়— বরং তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে মেনে নিয়েই তিনি কথা বলেন। কিন্তু এমন আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা প্রকাশ করা হয়, যা একজন সত্য নবীর জন্যে মোটেই মানানসই নয়। একজন আসমানী ওহীর বাহকের কিংবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য কোনো ওলীর জন্যেও যা মুনাসিব ও উপযোগী নয়। বরং সেখানে ফুঠে ওঠে শুধু একজন

সফল, সার্থক (রাজনৈতিক) নেতার চেহারা। সেখানে নবী ও পয়গাম্বরসুলভ কীর্তি ও অবদানের বদলা শুধু এ-কথা বলেই শেষ করে দেয়া হয় যে, 'মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে দারুণভাবে তিনি ধারণা ও জ্ঞান লাভ করে ফেলেছিলেন'। এখন সরলমনা যে মুসলমান ছাত্র বা পাঠক শুরু থেকেই লেখকের উদারপন্থী, স্পষ্ট ও বাস্তবমুখী রচনাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসছে, পড়তে-পড়তে হঠাৎ যখন সে এমন স্থানে এসে পৌঁছবে তখন স্বাভাবিকভাবেই লেখকের বর্ণনায় সে প্রভাবিত হতে বাধ্য হবে এবং ঠিক লেখকের মনের চাহিদা অনুপাতেই তা ঘটবে। অনিচ্ছায় হলেও তখন সেও নবীকে শুধু একজন সফল ও সার্থক সিপাহসালার, একজন আত্মপ্রত্যয়ী বিজয়ী বীর, একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনাকার ও ব্যবস্থাপক হিসাবেই দেখার ও বোঝার এবং তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার ব্যাপারে আগ্রহী ও সন্তুষ্ট হয়ে পড়বে। খৃষ্টান মিশনারী ও পাদ্রীদের আক্রমণ সাধারণতঃ সামনাসামনি ও খোলাখুলি হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকরা হামলা করেন পেছন থেকে (অথবা পাশ থেকে) অজ্ঞাত সারে—হঠাৎ করে।

যুদ্ধের বিজয়ধারা স্বতন্ত্র মু'জিযা

যুদ্ধের বিজয়ধারা নবীজীর একটি আলাদা মু'জিযা। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ দলিল। কাফিরদের পক্ষ থেকে বারবার এ-দাবি ওঠতো— 'সুস্পষ্ট কোনো 'ফুরকান' কেনো অবতারিত হচ্ছে না?' জিহাদের ময়দানের বিস্ময়কর বিজয়ধারাই তখন চাক্ষুষ 'ফুরকান' হিসাবে প্রতিভাত হলো সবার চোখের সামনে। তাদের দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ ও বিস্ফারিত করে দেয়ার মতো সে-সব বিজয়ধারা ও সাফল্যকে অস্বীকার করার কোনো পথ রইলো না কোনো কট্টর অস্বীকারকারীর পক্ষেও। কিন্তু সাম্প্রতিককালের শিক্ষিত সভ্যরা অবশ্য অস্বীকার করেন— তবে একটু ভিন্ন পথে। তারা মেনে নেন ঘটনাকে। তারপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে তালাশ করতে থাকেন বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত। আগের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা 'মু'জিযা'কে 'যাদু' আখ্যা দিতো। আর সাম্প্রতিককালের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের তথা-কথিত উজ্জ্বল ধ্যান-ধারণার কিছু 'আধুনিক পরিভাষা' রপ্ত হয়ে যাওয়ায় সেগুলো দিয়েই তারা নিজেদের মনকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন।

ইসলামী বিশ্বধারার ভূমিকায় ডক্টর ফিলপে সাহেব লিখেছেন—
'খসরু ও হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে রোম ও পারস্যের মাঝে যে বিস্ময়কর ও ভয়ংকর যুদ্ধ বেধেছিলো, তার সবই ঐ মহান প্রভাবের সামনে নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে পড়েছিলো, যে প্রভাব তাদের সমসাময়িক আরবের পয়গাম্বর মুহাম্মদ তাদের সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনধারার উপর ফেলতে শুরু করেছিলেন, যা কব্জা করার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিলো সাম্রাজ্যদ্বয়ের আজীবন।'[১]
যেনো নবীজীর মু'জিযার শক্তিকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেখতে-দেখতে যে বিপ্লব তিনি সূচিত করেছিলেন, সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ও সমরোপকরণ থাকা সত্ত্বেও তার নজির পেশ করতে রোম-পারস্যও অক্ষম প্রমাণিত হলো, কিন্তু (আর এখান থেকেই স্থাপিত হয় বিভ্রান্তির ভিত্তি) তার অর্থ এই নয় যে, নবী তাঁর নবুওতের দাবিতে সত্যবাদী ছিলেন, বরং এই সাফল্যের পিছনে যা সবচে' বড় ও আসল কারণ, তা হলো শুধু এই যে, তিনি খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন।
তিনি লিখেন—
'এশিয়ার প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে একজন নবী ও পয়গাম্বর হিসাবে মুহাম্মদের কামিয়াবী ও সফলতা এবং বংশানুক্রমে সমাজের সকল স্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্ব এ-কথাই প্রমাণিত করে যে এই অসাধারণ মানুষটি মূলায়ী কিরগিজ এবং আলেকজাণ্ডার-এর এক দুর্লভ সমষ্টি ছিলেন।'

পূর্ণতার সমাবেশ

ভিন্ন শব্দে এটাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, নবীজীর ব্যক্তিত্ব ছিলো সাধারণ মানুষের অনেক ঊর্ধ্বের। এটাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, তাঁর সংস্কারধর্মী কীর্তি ও অবদানসমূহ ছিলো বিস্ময়কর। কিন্তু এ-বিষয়টি মেনে নেয়া যেনো সম্ভবই হলো না যে এমন মানুষ নিজের দাবি-দাওয়াতেও সত্যবাদী ছিলেন। বরং তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যের রহস্য শুধু এই ছিলো যে, তাঁর সত্ত্বায় বড় বড় বিজেতা, বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও আইনজ্ঞদের 'দুর্লভ গুণাবলী'র সমাবেশ ঘটেছিলো।

---

১. অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-২, পৃ: ৩৫২।

ইতিহাস বলে, আবু জেহেল যখন নবীজীর জড়-জাগতিক নিদর্শনাবলী ও মু'জিযার সামনে অক্ষম ও লা-জওয়াব হয়ে পড়তো, তখন শেষ পর্যন্ত এই বলে নিজের লজ্জার আবীর মুছে ফেলার চেষ্টা করতো— (নাউযুবিল্লাহ্) 'এ আসলে এক জাঁদরেল যাদুকর।' সাম্প্রতিককালের প্রগতিবাদী ও মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের নবুওতকে অস্বীকার করা কি আবু জেহেলের অস্বীকার করার সেই চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা থেকে কিছু ভিন্নতর?!

কোথায় তার নজির

পৃথিবীতে কোন্ আলেকজান্ডার,
কোন্ নেপোলিয়ন,
কোন্ চেঙ্গিস এ রকম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ ছাড়া এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করতে পেরেছিলো—
শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া?
কোন্ ফউজি জেনারেলের সিপাহিরা নিজেদের চরিত্র-মাধুর্য ও সুকুমার মননের এমন নমুনা পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলো?
কোন্ বিজয়ী সম্রাটের অধিনস্তরা এমন সত্যান্বেষী,
এমন ধর্মপরায়ণ,
এমন সৎ ও চরিত্রবান ছিলো?
বিশ্বের কোন্ সিপাহীরা সারাদিন সিয়াম সাধনায় নিরত থেকেছে?
রাতব্যাপী তাহাজ্জুদের রুকু-সিজদায় ডুবে থেকেছে?
শুধু জান্নাত লাভের বাসনায়?
আল্লাহ্র কাছ থেকে মাগফিরাত ও ক্ষমা লাভের আশায়?
শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীরা ছাড়া?
কারা তারা? যারা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও শ্রেণী-বিন্যাসের প্রতি ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টি রেখে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় কোণায় বসবাসরত বনি আদমের প্রতিটি বংশ, গোত্র, জাতি সম্প্রদায়ের জন্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্যে অমন বিশ্বজনীন আইন-ব্যবস্থা প্রণয়নে সক্ষম হয়েছিলো?
নবীজী ছাড়া? তাঁর সাহাবী ও অনুসারিরা ছাড়া?

কোন্ আইন প্রণেতা ন্যায় ও ইনসাফকে, আমানতদারি ও ধর্মভীরুতাকে, আত্মসংস্কার ও আত্মশুদ্ধিকে যাবতীয় সাময়িক কল্যাণ ও ইচ্ছার উপর অগ্রাধিকার দিতে পেরেছে? ....

সেই পূতঃপবিত্র ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে,

সেই পূতঃপবিত্র ফেরেশতাসুলভ শিক্ষার উচ্ছল ঝর্ণাধারাকে দুনিয়ার অন্যান্য বিশ্ব বিজেতা ও আইন প্রণেতাদের কাতারে শামিল করতে লেখকের আত্ম সম্ভ্রমবোধে একটুও বাঁধলো না?!

এই যদি হয় জ্ঞান-গবেষণা আর বাস্তববাদিতার নমুনা, তাহলে আল্লাহই মা'লুম, অজ্ঞতা ও অবাস্তব ধারণা বলা হবে কাকে?

সামনে অগ্রসর হয়ে আবারো তিনি নবীজীর ব্যক্তিত্ব ও কীর্তিকে স্বীকার করছেন। কিন্তু এ যেনো লিখতে লিখতে হঠাৎ স্বম্বিৎ ফিরে পাওয়া— কোথাও আবার নবুওতের সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেলো না তো! নমুনা লক্ষ্য করুন—

'মুহাম্মদের জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিলো যখন সভ্য দুনিয়ার রাজা-বাদশা এবং আমির-উমারা-শ্রেণী বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয় ও দৈন্যের শিকার হয়ে পড়েছিলো। সে সময়কার পৃথিবীর সাধারণ সামাজিক পরিস্থিতি যে অবস্থানে ছিলো, তারচে' অধিক ভালো অবস্থা কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছিলো। আরবে শিরক ও পৌত্তলিকতার পরিবর্তে অন্য কোনো উত্তম মাযহাবের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো। ইরান, শাম ও মিসরের মানুষ 'মাযদকী, অগ্নি উপাসক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের হামলায় কোণঠাসা হয়ে একটি উত্তম ধর্মের অনুসন্ধান করছিলো।'[১]

তালাশে থাকার প্রমাণ কি এই?

যেনো সবাই ছিলো সেই উত্তম ধর্মের তালাশে! কিন্তু যখন এই 'উত্তম ধর্ম' পেশ করা হলো, তখন গোটা আরবই মুকাবিলা ও লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। দেশের ছোট্ট ছোট্ট শিশু-কিশোর ও বালক-বালিকারা পর্যন্ত তাঁর খুন-পিয়াসী হয়ে উঠলো! বলুন তো; অনুসন্ধান ও তালাশে থাকার এই কি প্রমাণ?

---

১. সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা-৩৫৩।

বছরের পর বছর এ-নতুন ধর্মের বাহকের বিরুদ্ধে ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর রক্তাক্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া,

তাঁর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা, তাঁর সাহাবীদের জীবনকে সংকীর্ণ করে তোলা—

এতে কেমন করে প্রমাণিত হয়— একটি নতুন ও উত্তম ধর্মের জন্যে তাদের সেই অস্থির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা? যদি তারা সেই নতুন ধর্মের অনুসন্ধানে এমনই ব্যাকুল ও অস্থির ছিলো, তাহলে কেনো সেই ধর্মের বাহকের বিরুদ্ধে এ-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম? কেনো কোণঠাসা করা হলো সে ধর্মের আহ্বানকারীর জীবন? আরব এবং তার প্রতিবেশীরা যদি একান্তই এমন কোনো নতুন ধর্মকে স্বাগত জানানোর জন্যে ব্যাকুল ও উন্মুখ হয়ে বসেছিলো, তাহলে কেনো এ-পয়গাম্বরকে তারা উষ্ণ ভালোবাসায় বিগলিত হয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালো না? আর সবাই যদি তাঁর ধর্ম কবুল না করলো, তো কমপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা কেনো সমকণ্ঠে 'লাব্বাইক' বলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলো না? আর তা না হয়ে যদি এ-নতুন দাওয়াতই কামিয়াবী ও সফলতার জামিন হতে পারতো, তাহলে ঠিক ঐ সময়ে মুসায়লামা এবং আসওয়াদ উনসীও তো নবুওতের দাবি নিয়ে খাড়া হয়েছিলো? তারা কেনো তবে সফল হতে পারে নি? তাদের ভাগ্যে কেনো এলো তাড়া-খাওয়া? জীবন দেয়া? কেনো এলো না কোনো 'সবুজ-শ্যামলিমা'?

ডক্টর ফিনলে সাহেব আমাদের এ-সব খোলা অভিযোগ ও প্রশ্নের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন না! নিশ্চয়ই তার জাগ্রত বিবেক-বোধে খটকা অনুভূত হয়ে থাকবে। কিন্তু আফসোস!! তার উর্বর মস্তিস্ক এমন জওয়াবই পরিবেশন করলো যা পড়ে হয়ত ভীষণ হাসি পাবে অথবা বুক ভেসে যাবে চোখের পানিতে!!

'আরব জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতির যে-উচ্ছ্বাস মুহাম্মদকে ময়দানে এনে খাড়া করেছিলো, এ-জনসাধারণই নিজ নিজ যামানায় এমনি আরো বহু পয়গাম্বরকে মাঠে নামিয়েছিলো। কিন্তু মুহাম্মদের উঁচু যোগ্যতা, ইনসাফ ও ন্যায়নীতির সঠিক ধারণা ও মূল্যায়ন বরং আমরা এটাও বলতে পারি যে, তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা সে-সব মানুষের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে বরবাদ করে দিয়েছে'। (পৃষ্ঠা-৩৫৩)

এখানে যেনো সব জিনিসের স্বীকারোক্তিই আছে। রাসূলের যোগ্যতা, বুদ্ধি ও মেধা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততাকে মেনে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি মেনে নিতে মনে সামান্যতম সন্দেহ কিংবা খটকাও সৃষ্টি হয় নি তা হলো— 'এ-সত্যবাদী ও যোগ্য লোকটি স্বীয় দাবিদাওয়াতেও সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ও চেষ্টাই জারি থাকবে। ফলপ্রসূ হবে।' যাতে অনেক ঘুরে ফিরেও কোনো পাঠক এই 'আকীদা বিশ্বাস' এর ধারে কাছেও ভিড়তে না পারে।

জীবনীকার কারলাইল

টমাস কারলাইল কোনো ঐতিহাসিক ছিলেন না। মূলত তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক। উনিশ শতকের নামজাদা লেখক ও সাহিত্যিকদের কাতারে তাকে শামিল করা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে 'হীরো এন্ড হীরো ওয়ারশিপ' (Hero and hero worship) নামে তিনি একটি পুস্তক লিখেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনার পর কোনো-না-কোনো উপায়ে তাদের হীরো সাব্যস্ত করেছেন তিনি। যেমন কবিদের ভিতরে হীরোর তালিকায় স্থান পেয়েছেন 'শেক্সপিয়র' ও 'দানতে'। রাজা-বাদশাদের মধ্যে ক্রমওয়েল ও নেপোলিয়ন। এ-সুবাদেই তিনি নবীজীকে নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন এবং তাঁকে পয়গাম্বরদের মধ্যে হীরো আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি তাঁর এবং ইসলামের পর্যালোচনা করেছেন।

শোনো হে প্রিয়তম!

কল্যাণকামীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ

এ-সুবিশাল পৃথিবীর বুকে যিনি সর্বক্ষণ মশগুল এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে, যিনি দিবসে নিমগ্ন থাকেন আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনে আর রাতে ব্যস্ত থাকেন সেই না-দেখা মাওলার উদ্দেশ্যে, রুকূ-সিজদার গভীরতায়। যিনি নিজের প্রিয় জীবনের একেকটি দিন, একেকটি সপ্তাহ, একেকটি মাস ও একেকটি বছর সঁপে দিয়েছিলেন— সেই একই ধ্যানে, একই সাধনায়! কিন্তু স্বগোত্র, স্বজাতি, স্বদেশী ও স্বজনদের কাছে তাঁর পুরস্কার ও বিনিময় মিললো এক রাশ গালি ও নিন্দা! তাঁর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করার সাথে সাথে তাঁর দেহকেও বানানো হলো ইট পাথরের নিশানা! এমনকি রক্তাক্ত করা হলো তাঁর পদযুগল! পবিত্র আংগুল থেকে প্রবাহিত রক্তের টপটপ ফোঁটা দেখে আনন্দ ও মজা লোটে নিষ্ঠুরতার দৃষ্টিরা! কী নারকীয় আত্মপ্রসাদ—উল্লাস!!

সত্যে অবিচল পদযুগল

যে-পদযুগলের উপর পৃথিবীর সমস্ত সেরা ও উঁচু মানুষগুলোর মাথা উৎসর্গিত, শুধু সত্যের পথ মাড়ানোর জন্যেই এবং আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদতের উপর অটল ও অবিচল থাকার জন্যেই যে-পদযুগলের সৃষ্টি, যখমি করা হলো সে-ই পদযুগলকেই! কী নিষ্ঠুরতা!!

আল্লাহ্‌র বান্দাকে মজবুর (বাধ্য) করা হলো যাতে রাত জেগে-জেগে ইবাদতের অভ্যাসকে অন্তত দু' তিনদিনের জন্যে হলেও ছেড়ে দেয়! এতোটুকুতেই ক্ষান্ত হলো না জালিমের দল। বরং এক শয়তান নারী —যে সম্পর্কে তাঁর চাচীও হতো— এসে বললো, 'ভাতিজা! মনে হচ্ছে তোর শয়তান তোকে তা'লিম দেয়া এখন ছেড়ে দিয়েছে!'

العياذ بالله

বান্দা যতো শ্রেষ্ঠই হোক, তবু সে বান্দাই। মানুষ যতো সেরাই হোক, তবু সে মানুষই। তাই এ-ধারণা কুদরতিভাবেই তাঁর মনে খেলে যায়— 'সেই মুখাপেক্ষীহীন সত্ত্বা বাস্তবিকই তো আমাকে ভুলে যান নি'!!

দুঃশ্চিন্তা এবং মুক্তি

এ-দুঃশ্চিন্তা জন্ম নিলো তাঁর হৃদয়ে, যিনি এসেছেন পৃথিবীকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবনের পথ দেখাতে! এদিকে এ-দুঃশ্চিন্তা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়াতে ওদিকে স্পন্দন জাগলো মহিমময় উর্দ্ধজগতে! দুঃশ্চিন্তা যদি বান্দার হয়েই থাকে, সে দুঃশ্চিন্তা দূর করতে আল্লাহ্ তো আর অক্ষম নন! অস্থিরতা যদি তাঁর সামনে একটু অন্তরায় সৃষ্টি করেই থাকে, তাই বলে সান্ত্বনা ও স্বস্তি প্রদানের নোসখা ও ব্যবস্থাপত্র তো আর দূরে ছিলো না!

অবতরণ করলেন মহিমময় জগতের দূত—হযরত জিবরীল আমীন! সাত আসমান 'পাড়ি দিয়ে' হাজির হলেন তাঁর খিদমতে সান্ত্বনা ও দুঃশ্চিন্তা-মুক্তির বার্তা নিয়ে। বললেন ঃ 'দুঃশ্চিন্তা আর অস্থিরতার কী আছে?

'وَالضُّحَى —ওয়াদ্‌দুহা—শপথ পূর্বাহ্নের'।

রাত পোহালো, ঊষা এলো বলে। বেরিয়ে এলো উজ্জ্বল প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো। উদিত হলো হিদায়াত ও নূরানিয়াতের প্রদীপ্ত সূর্য। ছড়িয়ে পড়লো সুসংবাদবাহী সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণমালা। ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেলো সে সূর্যের প্রদীপ্ত আভা।

সেই দয়ালু প্রতিপালক, যিনি বাহ্যজগতের আকার-আকৃতির ক্রমবৃদ্ধি সাধনের জন্যে, ইহজগতের পরিপূর্ণতার জন্যে, প্রত্যহ সূর্যকে ঝলমলিয়ে উদিত করেন, মানুষের আত্মিক প্রতিপালনের জন্যে কি তিনি হিদায়াতের রৌশনীর কোনো ব্যবস্থাই করবেন না?

সুতরাং হে প্রিয় মুহাম্মদ! প্রতিদিন এই প্রোজ্জ্বল দীপ্তিময় সূর্যের উদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার হিদায়াত ও নূরের উৎসস্থল ও ঝরনাধারা হওয়ার! তোমার সততার! তোমার রিসালাতের !

এ আলো-ঝলমল দিবসই শুধু নয়— এই নিঝুম শান্ত রজনীও তোমার সত্যবাদিতার একটি নিদর্শন! যে-রাত শুধু আরাম বিলায়, প্রশান্তি ছড়ায়, যে-রাতের আঁধারে সমস্ত প্রাণীরাই খুঁজে পায় আরাম ও শান্তি!!

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى.

'শপথ রাত্রির যখন তা নিঝুম হয়'। -দুহা: ২

যে মহান স্রষ্টা সৃষ্টির আরাম ও শান্তির জন্যে এ-রাতের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি মানুষের আত্মিক প্রশান্তির জন্যে কোনো ব্যবস্থাই করবেন না, তা কী

করে হয়? সূর্যের উদয় হওয়া আর রাতের নিঝুম হওয়া স্ব-স্থানে তাঁরই সাক্ষ্য বহন করছে।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

'তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগ করেন নি। তোমার প্রতি বিরূপও হন নি'। -দুহা: ৩

এবং অবস্থার নীরব ভাষায় এ-সাক্ষ্যও প্রদান করছে যে, হে সৃষ্টির হিতাকাঙ্ক্ষী! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ভুলে যান নি। তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নি! এ তো তোমার অস্বীকারকারীরা হিংসা, বিদ্বেষ, নিজেদের মূর্খতা ও দৃষ্টিহীনতার কারণে যাচ্ছে-তাই বলে বেড়াচ্ছে। এটা কী করে হতে পারে যে, যিনি তোমাকে রিসালাতের গৌরবে ভূষিত করেছেন তিনিই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন? কিংবা তোমার প্রতি বিরূপ হবেন! তিনি তো তোমার 'রব'! তোমার সব!! 'রব' হওয়াই তো প্রমাণ যে, তিনি তোমার সার্বক্ষণিক লালন-প্রতিপালনের যিম্মাদার! যে-উদ্দেশ্যে তিনি তোমাকে পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন তার পরিপূর্ণতার জন্যেও তো অপরিহার্য যে, তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার প্রতি বর্ষণ করে যাবেন— তাঁর রহমতের বৃষ্টি!

এ-অবুঝরা বলছে যে, তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেছেন .. তোমার প্রতি নারাজ হয়েছেন। তোমাকে ত্যাগ করা আর তোমার প্রতি নারাজ হওয়া— সে তো এক অকল্পনীয় ব্যাপার! তোমার প্রতিপালক তো তোমার সার্বিক অবস্থার উপর এই পরিমাণ স্নেহ-পরায়ণ ও দয়ালু যে, তোমার জন্যে রয়েছে শুধু ক্রমোন্নতি আর ক্রমোন্নতি! শুধু উপরে ওঠা, মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে .. শ্রেষ্ঠত্বের সোপান বেয়ে। তোমার পরকাল তোমার দুনিয়া থেকে অনেক ভালো।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى.

'নিশ্চয় পরকাল তোমার জন্যে দুনিয়া থেকে অনেক ভালো'। -দুহা: ৪

তোমার বিগত অবস্থার চেয়ে আগত অবস্থা আরও ভালো। আখেরাতের অবস্থা যখন বোঝা যাবে তখন তো বোঝা যাবেই। কিন্তু এ-পৃথিবীতেই তো অর্জিত হতে যাচ্ছে তোমার বিজয় ও সাফল্য— আমার নুসরাত ও

সাহায্যে! তোমাকে যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার ঘৃণ্য চিন্তায় মেতে উঠেছে, তোমাকে যারা জুলুম-নিপীড়নে উত্যক্ত করে তুলতে চায়, কিছুদিন পর তারাই লা-পাত্তা ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

মক্কা হবে তোমার!

মদীনাও হবে তোমারই!

তোমার নামের কালেমা ধ্বনিত হবে তায়েফের সবুজ-শ্যামলিমাঘেরা উদ্যানে! তোমার সিপাহীদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি অনুরণিত হবে খায়বরের দুর্গে!

প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকবে তোমার সম্মান ও মর্যাদা।

সহায়-সম্বলহীন হয়েই সর্ব প্রকার সাজ-সরঞ্জাম-সজ্জিত এবং শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীদের পরাস্ত করবে তুমি অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। এ-দুর্ভাগা ও আঁধার-ঘেরা হৃদয়ের লোকগুলো তোমাকে দূরে মনে করছে আমার রহমত ও নৈকট্য থেকে। অথচ তুমি আমার এতো নিকটতম ও প্রিয়তম যে, তোমার সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি এবং আমার সন্তুষ্টিই তোমার সন্তুষ্টি। তোমার উপর আমার দয়া ও করুণার এতো প্রবল বর্ষণ হবে যে, তৃপ্ত হবে তোমার তৃষিত আত্মা! শান্ত হবে তোমার অশান্ত মন!!

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.

'তোমার পালনকর্তা সত্বরই তোমাকে দান করবেন অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হবে'। -দুহা: ৫

তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

পূর্ণ হবে তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা!

এখানেও! ওখানেও!

ইহলোকেও! পরলোকেও!

আজো! কালও!

এ-দান ও পুরস্কার মিলবে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তাঁর রুবুবিয়াত তোমাকে নিয়ে যাবে পূর্ণতার শীর্ষচূড়ায়। আর এ-পূর্ণতার মধ্যে শামিল থাকবে দুনিয়া-আখেরাতের সকল পূর্ণতাই! দুনিয়ার দান ও করুণাধারার নমুনা হলো এই যে, তোমার হাতে-গোনা নিঃস্ব-দরিদ্র এ

ক'জন শাগরিদই নিজেদের অপেক্ষা দশগুণ, বিশগুণ, একশগুণ বীর বাহাদুর ও যোদ্ধাদের উপর—এক বিরাট বাহিনীর উপর—ধনবান সরদারদের উপর নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করবে।

তারা মক্কা বিজয় করবে! মদীনা শাসন করবে! ইয়েমেন দখল করবে! ইরাকে বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে! মিসরকে কালেমা পড়াবে! কায়সারের (সিজারের) রাজ প্রাসাদ ভেঙে গুড়িয়ে দেবে। ধুলোয় মিশিয়ে দেবে কিসরার (খসরুর) গর্বিত সিংহাসনও।

আর পরকালে তোমার পূর্ণত্বের প্রকাশ ঘটবে এভাবে যে, যখন পুণ্যাত্মাগণ ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকবে, বড় বড় নৈকট্যশীল বান্দারা পর্যন্ত নিজেদের চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়বে, যখন মুসা কালীমুল্লাহ, ঈসা মাসীহর মুখে পর্যন্ত 'নাফসী'—'আমার কী হবে! আমার কী হবে!' উচ্চারিত হবে, তখন- সে-ই মুহূর্তে 'হামদ'-পতাকা শোভা পাবে শুধু তোমারই হাতে। তখন শোনা হবে শুধু তোমারই কথা। গৃহীত হবে শুধু তোমারই আবেদন। সেদিন ইচ্ছেমতো তুমি যতোজনকে চাও— উদ্ধার করতে পারবে। আর কার উদ্ধারই বা তুমি চাইবে না? তুমি-যে প্রিয়জনদের মঙ্গলকামী! তাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়!!

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

'তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল দয়ালু'। -তাওবা: ১২৮

সেদিন সবাইকে নিজের কাছে তুমি নিয়ে আসবে। বের করে আনবে জাহান্নামের আগুন থেকে, আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্রোধ থেকে।

এ-প্রতিশ্রুতি, এ-সুসংবাদ, আগামী দিনের জন্যে। তা দেখার জন্যে অগ্রদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। এইসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও অহংকারীর দল তো এতো ভীষণভাবে অন্ধ ও অন্তর্দৃষ্টি-বঞ্চিত যে, এ পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটে গেলো তাও তাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। এ পর্যন্ত হে নবী! তোমার সাথে যে-আচরণ করা হয়েছে তা একান্ত প্রিয়তম ছাড়া অন্য কারো সাথে হতে পারে কি?

এ-দৃষ্টিহীনেরা কি লক্ষ্য করে নি যে, কী নিঃস্ব, অসহায় অবস্থায় এ পৃথিবীর কোলে তুমি চোখ মেলেছিলে? পৃথিবীতে শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের আসল মাধ্যম হয়ে থাকেন পিতা। কিন্তু তোমার জন্মের পূর্বেই তোমার

এ-অবলম্বনটুকু পর্যন্ত সরিয়ে নেয়া হলো! পিতার পরে নিঃস্বার্থ সেবায় যিনি নিজেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখেন, তিনি হলেন মা! কিছুদিন পরই তার কোল থেকেও তোমাকে জুদা করে দেয়া হলো! শেষে ছিলো বৃদ্ধ দাদাজানের আশ্রয়! কিন্তু শৈশব না-পেরুতেই এ-স্নেহ ছায়াটুকুও তোমার মাথার উপর থেকে সরে গেলো! তখন ছিলে তুমি আর ছিলো তোমার এতিমী— পিতৃত্বহীন অসহায়ত্ব! না-ছিলো পারিবারিক স্বচ্ছলতা। না-ছিলো তা'লিম তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থা! আমার রুবুবিয়াত ছাড়া তখন কে তোমার হাত ধরেছিলো? আমার রহমতে কামিলা—অপার দয়া ছাড়া কে তোমায় সাহায্য করেছিলো? কে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন? কে তোমায় রক্ষা করেছিলেন বিপদ থেকে? কদমে-কদমে কে তোমায় হিফাযত করেছিলেন? তোমার গঠন-আকৃতি, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার চরিত্র— কে এমন সুন্দর করে গড়েছেন, সাজিয়েছেন? তোমার বাহ্যিক রূপে মুগ্ধ শাহজাদা আর আমিরজাদারা। আর বাতেন (আত্মিক রূপ) নিয়ে গর্ব করে সুফী-সাধক ও দরবেশরা। শত্রুদের হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচিয়েছেন? আবু লাহাবের তলোয়ার এবং আবু জেহেলের বর্শা তোমার কাছ থেকে আমিই কি দূরে সরিয়ে রাখি নি?

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.

'তিনি কি তোমাকে এতিমরূপে পান নি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন'।

-দুহা: ৬

শুধু তাই নয়, তুমি ছিলে এমন উম্মী ও নিরক্ষর যে, সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ চিন্তায়, তাদের মুক্তির পথ-তালাশে এবং তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে ছিলে সম্পূর্ণ বে-খবর। কোনো শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগারের সহযোগিতা ছাড়া, কোনো পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকের মাধ্যম ছাড়া কে দেখিয়েছেন তোমাকে হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথ? আমি কি তোমার সামনে খুলে দিই নি 'ইলমে লাদুন্নী' তথা সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের কিতাব? কে আলোকমণ্ডিত করে দিয়েছেন তোমার হৃদয়ের পর্দা— যা আগে-পরের কারো জন্যেই করা হয় নি?

এ-সব রুবুবিয়াতে কামিলার (পরিপূর্ণ প্রভুত্বের) নিদর্শন না হলে আর কী হতে পারে?

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.

'তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা (বেখবর), অতঃপর পথ প্রদর্শন করলেন'। -দুহা: ৭

অনুরূপ তুমি ছিলে সবদিক থেকে মুখাপেক্ষী—অভাবী, কে করেছেন তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন—অভাবমুক্ত? আমার পরিপূর্ণ রহমত ও সর্বব্যাপী প্রভুত্ব ছাড়া আর কে তোমাকে খাদিজার স্বচ্ছল অবস্থায় তার অংশীদার করেছিলেন? প্রাচুর্যশালী মুহাজিরীন সাহাবীদের হৃদয়ে কে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন তোমার জন্যে তাদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অনুপ্রেরণা?

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.

'তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাব দূর করেছেন'। -দুহা: ৮

তোমার হৃদয় ছিলো অস্থির ও ব্যাকুল এই ভেবে যে, পৃথিবীতে কী করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তখন তাওহিদের সপক্ষীয় প্রামাণ্য দলিল দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো তোমার হৃদয়। বদলে দেয়া হলো তোমার এ-অভাববোধ ও অসহায়ত্বকে। আমি শুধু তোমাকেই মাগফেরাত ও নাজাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করি নি, বরং ব্যাপকভাবে ঘোষণা করে দিলাম— যে কেউ তোমাকে 'ওসীলা' ও মাধ্যম বানিয়ে, তোমার নামের আশ্রয় ধরে আমার কাছে আসবে, সে-ই লাভ করবে আমার ক্ষমা-ঘোষণা—নাজাত ও মুক্তি!

যেখানে তুমি শুধু নিজের জন্যে পথ-তালাশ করছিলে, সেখানে আমি তোমাকে রাহবার ও পথপ্রদর্শকই শুধু করি নি বরং পৃথিবীর সকল রাহবারদের সরদার ও পথপ্রদর্শকদের ইমাম হওয়ার মার্যাদায়ও ভূষিত করে দিলাম! এ-আচরণ যদি একান্ত মাহবুব ও প্রিয়তমের সাথেই না-হয় তাহলে আর কার সাথে হতে পারে?

ভবিষ্যতের কথা না হয় থাকলোই। এ-দৃষ্টিহীন কাফিররা, এ-হিংসুক লোকগুলো কি অতীতেও তোমার নৈকট্য ও মর্যাদা লাভের এ-সব চাক্ষুষ নিদর্শনাবলী দেখতে পায় নি? মহব্বত ও প্রেম–ভালোবাসার এমন মর্যাদা লাভ— সারা পৃথিবীময় কোন্ মাহবুব ও প্রিয়তমের ভাগ্যে জুটেছিলো?

এ- ইশক-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার ধাপ ও মর্যাদা এখনো শেষ হয়ে যায় নি। প্রিয়তমদের নিজ সত্তাই শুধু প্রিয় হয় না, তাদের একেকটি গুণ পর্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে। তুমি ছিলে এতিম। তাই আজ 'এতিম হওয়াই' আমার কাছে প্রিয় হয়ে গেছে!!

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ.

'সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না'। -দুহা: ৯

আজ থেকে কোনো এতিমের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ ও অশালীন ব্যবহারকে আমি বরদাশত করবো না! যে এতিমের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবে, সেও 'নিষ্ঠুরতা'র সম্মুখীন হবে! যে এতিমের মাথায় বুলিয়ে দেবে না— স্নেহ-মমতার হাত, সে নিজেও বঞ্চিত থাকবে স্নেহ-মমতা থেকে! যার হৃদয়ে থাকবে না এতিমের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি, সে হৃদয়হীনের সাথেও করা হবে 'হৃদয়হীন' আচরণ। এ-ঘোষণা জারি করা হচ্ছে আমার কিতাবে চিরদিনের জন্যে। এ-কিতাব সাক্ষি হয়ে থাকবে এতিমের সম্মান ও মর্যাদার। আর আমার দীন সংরক্ষণ করে যাবে এতিমদের হক ও অধিকার।

তুমি কতোদিন ধরে পথ খুঁজে ফিরছিলে! কতোকাল ধরে তুমি আত্মার প্রশান্তি তালাশ করছিলে! দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তুমি শুধু চেয়ে-চেয়ে ফিরছিলে। তারই স্মারক হিসাবে আমার এ-ঘোষণা—

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ.

'আর যে হাত পাতে—কিছু চায়, তাকে ধমক দিয়ো না'। - দুহা: ১০

যে চাইবে, আমি তার দেখাশুনা ও পাহারাদারি করবো। পাহারা দেবো তার ইজ্জত ও সম্মান। ভিক্ষাপ্রার্থী কোনো ক্রমেই নিষ্ঠুর ও অশালীন আচরণের পাত্র হতে পারে না। নম্রতা, হৃদ্যতা ও মিষ্টি ব্যবহার তার ন্যায্য পাওনা। আর যারা তালাশ করবে হিদায়াত ও সত্যের পথ, যারা পা রাখবে ইলম অন্বেষণের পথে, তারাও এ-কোমল ও মধুর আচরণের হকদার। রক্ষা করতে হবে তাদের মন। আজ থেকে আমার আসমানী কিতাব দুনিয়াবাসিকে এ-নির্দেশ প্রদান করছে যে, প্রার্থনাকারী ও ভিক্ষুকদের সঙ্গে

স্নেহ-মমতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করো। আর কেনোই বা নয়, এদের প্রত্যেকেরই তো আরবের সেই মহান সওয়ালকারীর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে! সর্বোপরি তোমাকে আমি পেয়েছিলাম ভীষণ মুখাপেক্ষী অবস্থায়। যে পর্যায়ের ছিলো তোমার অভাব ও শূন্যতা, ঠিক সে পর্যায়ের দৌলত ও নেয়ামত আমি তোমাকে দান করেছি। এই দৌলতের নাম 'দৌলতে নবুওয়ত'! 'দৌলতে কুরআন'!! এরচে' বড় দৌলত আর কী হতে পারে? প্রিয়তমকে দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার এরচে' আর কী হতে পারে? হ্যাঁ .. আমার এ-নেয়ামত লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়, বিলিয়ে যাও। বণ্টন করে যাও। যতোটুকু তোমার সাধ্যে কুলোয়। ব্যাপকভাবে জারি করো এ-নেয়ামতের ফল্গুধারা। রহমতের এ-ফোয়ারা থেকে উপকৃত করো প্রত্যেককে। কেউ যেনো বঞ্চিত না হয়!

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

'এবং প্রকাশ করতে থাকো তোমার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা।'

-দুহা: ১১

হে মক্কার এতিম!

হে হেরা গুহায় সাধনামগ্ন!

দেখলে তোমার মর্যাদার উচ্চতা!

দেখলে তো আল্লাহ্‌র সাথে তোমার প্রেমময় সম্পর্কের গভীরতা!

তোমার খাদেম এবং গোলামরাই শুধু নয়, বেঈমান কাফির মুশরিক ও হিংসুকরাও—সেই দৃষ্টিহীন হৃদয়হীনরাও আজ তোমার সৌভাগ্যের সোনালী সূর্যের ঝলমলানি ও জ্যোর্তিময়তা প্রত্যক্ষ করেছে। যারাই তোমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে তাদের নাম-নিশানা। আর যারা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মস্তকাবনত করেছে, সম্মানিত হয়েছে তারা। উঁচু হয়েছে তাদের মাথা। পৌঁছে গেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে! মঞ্জিলে মাকসুদে! আবু জেহেল ও খাত্তাব-পুত্র তো ছিলো একই সারির দু'জন মানুষ! আবু জেহেল তোমার সাথে দুশমনি করলো। দুশমনি করলো নিজের সাথেও। ফলে বিবেক-বুদ্ধি, সুনাম–সুখ্যাতি, চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা, আসমান-জমিন— সবই তার দুশমন হয়ে গেলো!

আর খাত্তাবের পুত্র!
আপন মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো তোমার সামনে!!
ফলে সব কিছুই ঝুঁকে পড়লো তার সামনে!!
ঝুঁকে পড়লো বিপুল রত্নরাজি ও ধনভাণ্ডার!
ঝুঁকে পড়লো অগণিত ফওজ ও সৈন্য-সামন্ত!
ঝুঁকে পড়লো সর্বস্তরের মানুষ!
ঝুঁকে পড়লো সুনাম-সুখ্যাতি!
ঝুঁকে পড়লো সিরিয়া, ইরান, মিসর ও ইরাকের রাজ সিংহাসন ও রাজ মুকুট!
তাঁর ফারুকী শাসনের সামনে আরো ঝুঁকে পড়লো রাজ্যের পর রাজ্য!! দেশের পর দেশ!!

তাসাওউফে মুহাম্মদী

প্রাচীন তরীকতপন্থীদের মধ্যে শায়খ আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল-ওয়াসেতী নামে এক বুযুর্গ ছিলেন, যাঁকে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী 'আলেমে আমেল' (আমলদার আলেম) এবং 'আরেফে কামেল' (কামেল আল্লাহওয়ালা) উপাধিতে স্মরণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন—

'তিনি ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ মাশায়েখ'-এর অন্যতম। যুগ-বরেণ্য ইমাম। সুন্নতে নববীর অনুসরণ-অনুকরণ ও তা বিস্তারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বে-নজির।'

الفقر المحمدي। নামে এই বুযুর্গের একটি আরবী পুস্তিকা রয়েছে। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী কোনোক্রমে তার একটি নোসখা হাতে পেয়েছিলেন। পছন্দ হয়ে গেলো তাঁর। তরজমা করলেন ফারসীতে। তরজমার নাম দিলেন

"تحصيل الكمال الأبدي باختيار الفقر المحمدي"

'মুহাম্মদী তরীকার ফকীরী ও তাসাওউফের পথ ধরে চিরস্থায়ী পূর্ণত্ব লাভ', যা তাঁর রাসাইল ও মাকতুবাত সংকলনের পাঁচ নম্বরে স্থান পেয়েছে।

আজকাল তাসাওউফের অনেক দোস্ত-দুশমন ও পক্ষ-বিপক্ষের মানুষ 'তাসাওউফ'-কে ইসলামী শরীয়তের গণ্ডিমুক্ত একটি পৃথক বিষয় মনে করছে। এ-উভয় জামাতের লোকদের জন্যেই সম্ভবতঃ তাসাওউফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু মূলকথা সামনে এসে যাওয়া একান্ত জরুরী মনে করছি। আলোচ্য কিতাবটির শাব্দিক অনুবাদ নয় বরং শিরোনাম নির্ধারণ করে আমি নিজেই সংক্ষেপে তার বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

তাসাওউফের মূলনীতি

সত্যিকারের 'তাসাওউফ ও সুফীবাদ'-ই যদি কেউ অনুসন্ধান করে, যার গোড়া হবে মজবুত ও শক্তিশালী এবং যার শাখা-প্রশাখা হবে বুলন্দ ও

সুপ্রসারিত, তবে অপরিহার্যভাবেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ্র রাসূলের তাসাওউফ ও সুফীবাদ এবং আগে-পরে অনুসরণ করতে হবে শুধু তাঁকেই। কেননা স্বচ্ছ ও নির্মল পানি তো মিলবে সেখানেই, যেখান থেকে উৎসারিত হয়েছে মূল ঝরনাধারা। আর পরবর্তীদের (বিকৃত) তাসাওউফ ও সুফীবাদ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। কেননা ঝরনাধারা থেকে পানি যখন 'দূরে' চলে যায়, তখন সে পানি আর স্বচ্ছ ও পবিত্র থাকে না। বদলে যায় সে পানির রঙ-স্বাদ-গন্ধ।

এই জামাতের পরিণতি

এ-মুহাম্মদী তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলেই কেবল পূর্ববর্তীদের পুণ্য কাফেলায় শরীক হওয়ার আশা করা যেতে পারে। যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন আল্লাহ্র নবীর সুহবত ও সাহচর্যে। তাহলেই কেয়ামতের কঠিন দিনে জায়গা মিলবে মুহাম্মদী ঝাণ্ডার ছায়াতলে। হাশর হবে রাসূল-প্রেকিদের সাথে।

তাসাওউফের অর্থ

আজকাল মানুষের মুখে-মুখে শোনা যায় তাসাওউফের কথা। কিন্তু তাসাওউফের মর্ম ও বাস্তবতা সম্পর্কে কমসংখ্যক লোকেরই জ্ঞান রয়েছে। তারা জানে না কোত্থেকে আরম্ভ হয় তাসাওউফ এবং কোথায় তার শেষ। এ-তাসাওউফের প্রকৃত অর্থ যদি সামনে এসে যায় এবং তার প্রাথমিক স্তরসমূহ সম্পর্কে যদি একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় তাহলে তার 'শেষ' কী হতে পারে তারও একটা ধারণা অবশ্যই পাওয়া যাবে।

'তাসাওউফের ময়দানে কদম রাখার সময় হবে তখনই, যখন তৈরী হবে যাবতীয় নিষিদ্ধ-কাজ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা আর অর্জিত হবে প্রতিটি হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান মেনে চলার শক্তি, ক্ষমতা ও অনুরাগ।'

তাসাওউফের অপরিহার্য শর্তসমূহ

এ-সাগরে ডুব দেয়ার শর্ত হলো— মুত্তাকীগণ যেমন নিজেদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তেমনি একজন

সুফী-সাধককেও নিজের অন্তকরণকে বাঁচিয়ে রাখাতে হবে গোনাহ্র চিন্তা থেকে। তার মনে যদি কোনো কুচিন্তা এসেই পড়ে, তাহলে সাথে সাথে তা থেকে তাওবা করতে হবে। কারণ সত্যিকারের সুফী-সাধকের মনে একমাত্র আল্লাহ্র ধ্যান ছাড়া, তাঁর রিযা ও সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু স্থান পেতে পারে না! একদিকে থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও বন্ধুত্ব লাভের দাবি, অপরদিকে তার হৃদয়ে বাসা বাঁধবে জাগতিক চিন্তা ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা— এটা একজন সুফী-সাধকের জন্যে অতিশয় লজ্জাকর।

এ হলো তাসাওউফের প্রাথমিক স্তর। যতোক্ষণ পর্যন্ত এ-ক্ষমতা অর্জিত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মুখে তাসাওউফের নাম নেয়াও হবে লজ্জাকর ও বাচালতা। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার পর নিয়মিত সমস্ত হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান পালনের পাশাপাশি মনকে যাবতীয় কুচিন্তা ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখার পর দ্বিতীয় শর্ত হলো আল্লাহ্র তলব (খোঁজ) ও মহব্বত তাঁর হৃদয়-মনকে ঘিরে নেবে। তার হৃদয়-মন ও স্বভাব-প্রকৃতি আল্লাহ্র মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসায় বিভোর হয়ে থাকবে। তার হৃদয়-মন থেকে উধাও হয়ে যাবে সব রকম পার্থিব লালসা ও মোহ-মায়া। শুধু প্রেমময় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সে সঁপে দেবে তার সকল তনু-মন। এ-সব অর্জিত হওয়ার পরই তাসাওউফের নাম মুখে আনা সাজবে। নইলে তাসাওউফের দাবি হবে নিছক লোক-দেখানো ভণ্ডামি!

তাসাওউফের ইমামদের মর্যাদা

উপরে যে শর্ত বিবৃত হলো, তা প্রাথমিক পর্যায়ের। অর্থাৎ যারা তাসাওউফের ময়দানে পা রাখবে, তাদের জন্যে। কিন্তু তাসাওউফের এই প্রাথমিক স্তরের শর্তের কথা শুনতেই যে-হৃদয় প্রস্তুত নয় এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্যেও তৈরী নয়, সে-হৃদয়কে তাসাওউফের ইমামদের পরিপূর্ণ মর্যাদার কথা কী করে বোঝানো যাবে? আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বা এ-ছোট্ট কিতাবের ক্ষুদ্র পরিসরে কিভাবে সম্ভব? শুধু তাদের মর্যাদার উপর একটা অনুমান লাভ করা যেতে পারে।

মিথ্যা দাবিদার

সত্যি, এখানে এসে দুঃখের কান্না থামিয়ে রাখা যায় না! কেননা আমাদের মধ্যে এমন দলও তৈরী হয়ে গেছে, যারা হারাম খায়, লিপ্ত থাকে অন্যায় অনাচারে। হাতের নাগালের সবকিছু তাদের দৃষ্টিতে হালাল।

এদের দিবস-রজনী কাটে সুস্বাদু খাবারের চিন্তায়। অপরূপা যুবতী নারীর চাঁদ-মুখ-দর্শনের ব্যাকুলতায়।

নাচ-গানের আসর না বসলে এদের 'মুড' ই তৈরী হয় না। এদিকে সাধারণ সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে বড় বড় দাবি! জনসাধারণকে বশ করার যাদু বেশ এদের জানা। অবৈধ উপায়ে সম্পদ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধারণ করে এরা বিচিত্র সব বেশ-ভূষা। আসলে এ-সব ভণ্ডরা অনুভবই করতে পারে নি ইসলামের মজা ও স্বাদ। এরা বঞ্চিত ঈমানের স্বাদ থেকে। নাচ-গানের আসরে কাটে এদের বিনিদ্র-রজনী। সালাত আদায়ের জন্যে যখন দাঁড়ায়, জমিনে ঠোকর মেরে-মেরে আবার দাঁড়িয়ে যায়। রাজা-বাদশাহ ও আমির-উমারাদের দরবারে অবলীলায় চলতে থাকে এদের যাতায়াত। তাদের কাছ থেকে 'নজরানা' হাসিল করতে পারলে ফেটে পড়ে এরা উল্লাস ও গর্বে (আল্লাহ এদের অনিষ্ট থেকে হিফাযত করুন)।

দুনিয়ার ডাকাতদের চেয়েও মারাত্মক দীনের এইসব ডাকাত। দুনিয়ার ডাকাতরা লুট করে অর্থ-সম্পদ। আর এরা লুটে নেয় মানুষের ঈমানের দৌলত। সাধারণ সরলমনা মানুষ প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়ে এদের কর্ম-কাণ্ডকেই 'তাসাওউফ' ভেবে বসে প্রতারিত হতে থাকে।

সত্যিকার সুফী-এর আলামত

যারা মুহাম্মদী তাসাওউফের সালিক–পথিক, তাদের একটি আলামত এই যে, তারা কুরআন তিলাওয়াতে অমৃত স্বাদ অনুভব করেন। তাতে বিভোর হয়ে থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ তাদেরকে ব্যাকুল করে তোলে! তিলাওয়াত শুনতে বসলে স্বয়ং 'মুতাকাল্লিম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্যোর্তিময় ছায়া তাদের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। প্রেমময় প্রতিপালককে ভালোবাসার দাবি করা হবে, অথচ তাঁর কালাম ও বাণী পড়ে স্বাদ ও মজা অনুভূত হবে না, হৃদয়-মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি আসবে না, পক্ষান্তরে স্বাদ অনুভূত হবে কবিতার আসরে, গান-বাজনায় ও হাত-তালির উষ্ণ পরিবেশে— এ-সব শুধুই ভণ্ডামি!

সামা'-সঙ্গীত ও কুরআন

আল্লাহ্‌র আশেক ও প্রেমিকদের সমস্ত স্বাদ ও মজা নিহিত রয়েছে আল-কুরআনে। তাদের হৃদয়ের আরাম ও শান্তির উপকরণও রয়েছে

এতেই। এ-কালামে পাক তিলাওয়াতের সাথে সাথে তাদের হৃদয়-মনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় আল্লাহ্র সাথে। কুরআনে বর্ণিত হুকুম-আহকাম, ইতিহাস, ঘটনা, ওয়াজ-নসীহত, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তি ও পরকালিন ভয়ের কথা শুনলে তাদের হৃদয় গলে যায়। আল্লাহ্র মহিমার সামনে তারা মিটিয়ে দেন নিজেদের অস্তিত্ব।

কারো কারো এ দাবি যে, কুরআনের সাথে নয়— কবিতার সাথে মানব-প্রকৃতির একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই কবিতা শুনলে স্বভাবগত ভাবেই হৃদয়ে একটা আন্দোলন ও তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং আকর্ষণ অনুভূত হয়। মূলত এটা একটা অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন ও অসার কথা। কারণ কবিতার ছন্দে ও সঙ্গীতের তালে ও সুর-ঝংকারে যে কোনো প্রাণী মাত্রেরই আন্দোলিত হওয়ার কথা। তাই চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার ও ছোট্ট শিশুরা পর্যন্ত সঙ্গীতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এটা মানব প্রকৃতি নয়; বরং সমস্ত প্রাণীরই স্বভাবগত ব্যাপার। মানুষের উন্নত স্বভাব-প্রকৃতির মর্যাদা ও অবস্থান এরচে' অনেক বেশী বুলন্দ ও উঁচু।

যে-হৃদয়ে ঘর বানিয়েছে ঈমান, ছাউনি ফেলেছে আল্লাহ্র প্রেম-ভালোবাসা, (যেমন ছিলো সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরবর্তীদের অবস্থা) সে-হৃদয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করলে, তাতে বিনয় ও নম্রতা এবং আগ্রহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি করলে— কেবল কুরআনের তিলাওয়াত ও শ্রবণই করতে পারে, অন্য কিছু নয়।

আমলী দিক-নির্দেশনা

সত্যিকার তাসাওউফের ময়দানে কদম রাখার জন্যে প্রথম আমলী দিক-নির্দেশ হলো এই যে, 'আপন প্রতিপালকের কাছে খাঁটি দিলে তাওবা করা। যিনি কুরআন ও রাসূলের মতো নেয়ামত দান করেছেন। অতঃপর নির্জনে—লোক চক্ষুর অন্তরালে বিনয়াবনত হয়ে দু'রাকাত নামায পড়া। তারপর দু'হাত বেঁধে নিজের ভুল-ত্রুটি ও গোনাহর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, যতোক্ষণ না হৃদয়ে নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। এ-সময় কেঁদে-কেঁদে তাওবা করা ও মাগফেরাত চাওয়া এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সায়্যিদুল ইস্তেগফার পড়া। অতঃপর রাসূলের তরীকা ও আদর্শের উপর অটল ও অবিচল থাকার জন্যে তাওফিক চাওয়া

এবং ভবিষ্যতের জন্যে এ-মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যে, আমার চোখ-কান-মুখ-পেট-লজ্জাস্থান ও হাত-পা— সর্ব প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবে যখন দিন শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে তখন চোখের সামনে ভেসে উঠতে হবে এই ছবি— আল-হামদুলিল্লাহ! আমার কর্ম-তালিকায় আজ নেই পরনিন্দা ও মিথ্যা। অশ্লীল বাক্য ব্যবহার থেকে আমার মুখ ছিলো সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। কান শুনে নি কোনো নিরর্থক ও অশ্লীল কথা। চোখ দেখে নি শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো জিনিস। আদায় করা হয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সমস্ত হক।

আমলী হিদায়াতের দ্বিতীয় পর্যায় এই যে, নিয়মিত জামাত সহকারে শরীয়তের শর্ত মুতাবিক সালাত আদায় করা। যাতে হাদীসে বর্ণিত 'ইহসান'-এর মর্মের পরিপূর্ণ আমলী ব্যাখ্যার প্রতিফলন ঘটে। কেননা মানুষের সঠিক অবস্থা সেটাই, যা সালাত আদায়কালিন সময়ে পরিদৃষ্ট হয়। বান্দা এবং আল্লাহ্র মাঝে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠাকারী জিনিস হলো— সালাত। যদি সালাতেই একাগ্রতা হাসিল না হয়, তবে তা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছেও যার একাগ্রতা হাসিল হয় না, অন্য সময়ে তা কল্পনা করাও অযৌক্তিক।

আর কবিতার আসরে হৃদয়ের একাগ্রতা এবং অন্য অবস্থায় তার অনুপস্থিতির কথা যারা বলে, তারা ভণ্ড! তাদের তাসাওউফ নষ্ট!

তাদের দরবেশী অবৈধ, তা দরবেশী নয়— স্পষ্ট ভণ্ডামি।

বুনিয়াদী কাজ

আল্লাহ্র রাসূলের সাথে প্রেমময় ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করছে সত্যিকার তাসাওউফের ভিত্তি। হৃদয়কে তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসার ভিতরই আবদ্ধ রাখতে হবে। তাঁকে বরণ করতে হবে নিজের শায়খ ও ইমাম হিসাবে। তাঁর নামেই পাঠাতে হবে অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। মজবুত ও সুদৃঢ় করতে হবে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার বাঁধনকে। দরবেশ ও সুফীদের হৃদয়ে তাদের মুরশিদদের প্রতি থাকে কী সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা! সেই মুর্শিদদের নামে তারা ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যান! সত্যিকারের দরবেশ যারা, রাসূলের সাথেও তাদের সম্পর্ক হওয়া

উচিত এমন সুগভীর ও প্রগাঢ়। হৃদয়ে যদি কারো চিন্তা আসে, আসবে তাঁর চিন্তা। চোখে যদি কারো ছবি ভেসে ওঠে, সে ছবি হবে তাঁরই। কানে যদি কোনো কিছু মধু ঢালে, সে হবে তাঁরই বাণী-চিরন্তন। কারো স্মরণে হৃদয়ে যদি সৃষ্টি হয় মাহাত্ম্য ও সম্মানবোধ, সে স্মরণের উপজীব্য হবেন তিনিই। যবান তরতাজা থাকবে দুরূদ ও সালাম পাঠে। মন সতেজ থাকবে, উজ্জীবিত হবে তাঁরই জীবন-চরিত শুনে ও জেনে। তাঁর হাদীস শুনলে গভীর থেকে গভীরতর হবে তাঁর প্রতি প্রেমের সম্পর্ক। তাঁর প্রতিই থাকবে প্রবল টান ও আকর্ষণ। তিনিই থাকবেন স্মরণে অমলিন। অনুসরণীয় হবেন শুধু তিনিই। সর্বক্ষেত্রে সব ব্যাপারে তাঁর হুকুম তা'মিলই হবে সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত। তাঁর আনুগত্য-প্রেমে এমনভাবে নিজেকে সঁপে দিতে হবে— যাতে যে দেখে সে-ই যেনো বলে— ঐ যে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ!

উক্ত পুস্তিকার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কথার সার নির্যাস উপরিউক্ত পংক্তিসমূহে এসে গেছে। শায়খ আব্দুল হক দেহলভী এ-সব কথা নকল করার পর নিজেও এর প্রতি জোর সমর্থন জানিয়েছেন। শরীয়ত পন্থীদের দৃষ্টিতে এতে কোনো আকীদা বিরুদ্ধ কথা কি আছে? তরীকতপন্থীরা কি এতে কোনো রকম আপত্তি তোলার ফাঁক পাবেন? পারবে কি কোনো দল ও জামাত এতে প্রশ্ন উত্তাপন করতে?

আমাদের প্রিয় নবীর ভাষায় সারা পৃথিবীতে এই পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিলো যে, অমুসলিম যদি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে, তাহলে মুসলমানদের সাথে অবিলম্বে সন্ধি স্থাপিত হতে পারে। আজ যদি ইসলামী দলগুলো শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা এবং তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে এসে এক হয়ে যায়, তাহলে পারস্পরিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং হিংসা-বিদ্বেষের কোনোরূপ অবকাশ থাকবে কি ?

ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক

মহান চরিত্রের একটি বিশেষ দিক, সংস্কার কর্ম এবং জুলুম-নির্যাতন

মঙ্গল ও কল্যাণের নকশা নিয়ে যতো সংস্কারক ময়দানে নেমেছেন তাঁদের কেউ কি রেহাই পেয়েছেন— অপমান, লাঞ্ছনা ও গালমন্দ থেকে? তারা কি নিরাপদ থাকতে পেরেছিলেন– 'কাফির' ও 'ফাসিক' আখ্যা থেকে? ইমাম আবু হানীফাও কি নিক্ষিপ্ত হন নি জালিমের কারাগারে? খোদ মুসলমানদের নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পিঠ থেকে কি ঝরে নি রক্তের লাল লাল ফোঁটা?! মুসলমানরা কি নিজ হাতে আগুনে ঢেলে দেয় নি ইমাম গাযালীর অমূল্য গ্রন্থ সম্ভার?!

ইসমাঈল শহীদের বিরুদ্ধে দেয়া হয় নি কি 'কাফির' ফতওয়া?! কিন্তু সেই মহা মানবের মুকাবিলায় এঁদের প্রতি যে জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে, তা অতি ম্লান, তুচ্ছ, কিছুই না। অথচ তিনি ছিলেন সৃষ্টির সেরা। যাঁকে পাঠানো হয়েছে পূর্বাপর সবার মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ বানিয়ে।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরও নয়, একটানা দীর্ঘ তেরটি বছর পর্যন্ত দুনিয়ার যাবত দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, নষ্ট, হতভাগা, শরাবী, জুয়াড়ী, প্রবঞ্চক, শঠ, লুণ্ঠক, হারামখোর, পাথর পূজারী, বৃক্ষপূজারী এবং মানবরূপী সাপ, নেকড়ে ও হিংস্র শ্বাপদদের জুলুম–নির্যাতনের মুখে তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে হয়েছিলো।

বর্তমানে শহরের কোনো বিচারপতি, কোনো নেতা কিংবা কোনো চৌধুরীকে কোনো চামার যদি সামান্য গালি দিয়ে বসে, তাহলে দেখা যাবে প্রতিবাদে গালির ঝড় বইয়ে দেয়া হয়েছে।

যাঁর সম্মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ, যিনি সবচে' অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত, যাঁর দেহ মুবারককে আদব ও সম্মান সহকারে স্পর্শ করতে পারলে নূরের ফেরেশতারা পর্যন্ত গর্ব অনুভব করে, সেই মহা মানবের সাথে কমজাত, কমিনা ও নষ্ট লোকেরা কী জঘন্যতম ও বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করেছিলো! কী অসহনীয় ও অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিলো!

ওরা কি মন ভরে তাঁকে উত্যক্ত করে নি?

তাঁর উদ্দেশ্যে নিন্দাবান ছুঁড়ে নি?

আরকাম গুহায় অবস্থানকালে জালিম নিষ্ঠুররা কি বন্ধ করে দেয় নি তাঁর দানা-পানি? তাঁকে ফেলে নি কি এক চরম সংকটময় ও বিপন্ন অবস্থায়? তিনি নিজেই বলেছেন— 'নবীগণ সবচেয়ে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন'।[১] আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক, নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের জীবনে কি নেমে আসে নি কেয়ামতের বিভীষিকা?

মোট কথা; কষ্ট-ক্লেশ, অপমান, লাঞ্ছনা, পদে-পদে অপদস্থ করা এবং দৈহিক ও মানসিক শাস্তির কোনো দিক কি তারা বাকি রেখেছিলো? অস্বীকার করতে পারবে ইতিহাস?

তারপরও সেই মহা মানবের ধৈর্যে, হিম্মতে এবং তাঁর অটল-অবিচলতায় ক্ষণিকের তরেও একটু ভাটা পড়লো না।

এ-মহা দৃষ্টান্তের সামনে কেউ পারবে কি নিজেকে পেশ করতে?

এ-পাহাড়ের সামনে নিজের বালির টিলাকে উপস্থিত করে,

এ-নজিরবিহীন দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ঘোষিত হোক—

দীনের জন্যে কে কী করেছে?

কে কতোটুকু ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে?

কী হারিয়েছে?

কী বিলিয়েছে?

কী বরদাশ্‌ত করেছে?

জুলুম-নিপীড়ন এবং মুহাম্মদী আদর্শ

জুলুম-নিপীড়ন, দারিদ্র-অসহায়ত্ব এবং অভাব-অনটন আমাদের জীবনে অল্প-বিস্তর এসেই থাকে। একটু সান্ত্বনা ও আত্মপ্রশান্তি লাভের জন্যে মুহাম্মদী আদর্শের চেয়ে বড় কোনো আদর্শ মিলবে কি? তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি সান্ত্বনার সামান্য উপকরণ? কিন্তু তাই বলে কি সুদিনে, স্বচ্ছল অবস্থায় ও বিজয়ের দিনে তাঁর জীবনে কোনো আদর্শ মিলবে না? তখন কি ছিন্ন হয়ে যাবে তাঁর সাথে উম্মতের সম্পর্ক? যদি তাই হয়, তাহলে বলুন তো নেতৃত্বদানকালে এবং দেশ বিজয়ের মুহূর্তে সে-মহান নেতার আবদিয়াত ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে কি কোনো

---

১. أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

ভাটা পড়েছিলো? কোনো রকম শিথিলতা পরিদৃষ্ট হয়েছিলো? ক্রমবর্ধমান ও সীমাহীন ব্যস্ততার ভিতরেও কি তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছিলো? বড় বড় যুদ্ধাভিযানের ব্যবস্থা, ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনা, রসদপত্র ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, উট-ঘোড়ার ব্যবস্থা করা, হাতিয়ার খরিদ করা, যুদ্ধের ময়দান নির্বাচন করা, সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করা, বাহিনীর প্রতি যাত্রা ও বিরতির নির্দেশ জারি করা, সন্ধিকালে সন্ধির শর্তাদি স্থির করা, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ'-এর সুষম বণ্টন এবং রাজা-বাদশাদের নামে চিঠিপত্র ও বার্তা প্রেরণ— এ-সব গুরু দায়িত্ব একাই তো পালন করে গেছেন তিনি! যে কাজে আজ প্রয়োজন হয় ডজন ডজন বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ মানুষের? প্রয়োজন হয় বহু সেনাপতি, প্রকৌশলী, জেনারেল ও পরিচালকের! কিন্তু বলুন তো; সে দায়িত্ব পালনের ভিড়ে তাঁর সালাত আদায়ে কি কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিলো? প্রভাব পড়েছিলো কি তাঁর দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগীতে? আজ কি কারো ব্যস্ততা তাঁর চেয়েও বেশী? কার ব্যস্ত জীবন তাঁর মুকাবিলায় পেশ করা সম্ভব? আছে কি মুহাম্মদী কাফেলায় কোনো প্রতিযোগী?

ক্লান্তিকর ব্যস্ততা এবং সহনশীলতা ও অবিচলতা

যুদ্ধকালীন সময়ের কথা বাদ দিন। যুদ্ধমুক্ত নিরাপদ সময়ের কথাই ধরুন না! কী চিত্র দেখছেন?! তায়েফ ইসলাম কবুল করছে। ইয়েমেন থেকেও আসছে ইসলাম কবুলের সুসংবাদ। বাহরাইন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইসলামের ছায়াতলে। উমান আত্মসমর্পণ করছে ইসলামের কাছে। মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে মুযায়নার প্রতিনিধি দল।

আসছে বনু তামীমও। কায়সার-কিসরার নামে পাঠানো হচ্ছে চিঠিপত্র।

ইসলামের দাওয়াত পাঠানো হচ্ছে মিসর সম্রাটের কাছেও। কোনো কোনো গোত্রের উপর ধার্য করা হচ্ছে জিযয়া—কর-ব্যবস্থা। নির্ধারণ করা হচ্ছে কোনো নওমুসলিম গোত্রের উপর যাকাতের বিধি-বিধান। এদিকে বিভিন্ন স্থানের জন্য 'দাঈ' (আল্লাহ্‌র পথের আহবানকারী) ও মুআজ্জিন নিযুক্ত করা হচ্ছে। নিয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের জন্যে বিচারক ও প্রশাসক। বিদেশী দূত ও প্রতিনিধিদের সংগে চলছে আলাপ-আলোচনা। একই সময় ঘোষিত হচ্ছে বিভিন্ন 'মুকদ্দমা'র রায় ও ফায়সালা। চলছে

অসুস্থ ও পীড়িতজনের সেবা শুশ্রূষাও। সাথে সাথে চলছে হিসাব সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কাজও।

তারপরও বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ছে না তাঁর প্রাত্যহিক তাসবিহ্-তাহ্‌লিলে। বিনিদ্র রাত্রি-যাপন ও তাহাজ্জুদগুজারিও চলছে ঠিকমতোই। চলছে সেই দীর্ঘ মুনাজাত এবং বিনয়-নম্র ভঙ্গিতে সালাত আদায়। সালাতের ভিতর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতের আধিক্যে ফুলে যেতো তাঁর পবিত্র পদযুগল। বর্তমানে যদি বেড়ে যায় কারো সামান্য ব্যস্ততা, তাহলে নফল কেনো—ফরয পর্যন্ত ছেড়ে দেয়ার ছুতো ও অজুহাত হাতে এসে যায়। এদিকে আমাদের সামনে বিদ্যমান এ-নজির— সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্কে চুল পরিমাণও ছেদ পড়ে নি। যুদ্ধ হোক কিংবা সন্ধি, ফওজি ব্যবস্থাপনা হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দান, জমিদারি হোক কিংবা রাজ্য পরিচালনা, কৃষিক্ষেত্র হোক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য, কালেক্টরি হোক কিংবা ওকালতি, মিনিস্টারি হোক কিংবা গভর্নরী— মানব-জীবনের এমন কোনো দিক রয়েছে কি, যেখানে আমাদের জন্যে হিদায়াতের আলো মিলবে না সেই মহাসূর্য থেকে?

শ্রেষ্ঠ জীবন-সঙ্গিনীর বিরহ-শোক

কারো প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী যদি চোখের সামনে চিরতরে চলে যান, তাহলে স্বামীর জন্যে তা কী পরিমাণ মর্মভেদী হতে পারে?

রফীকাতুল হায়াত—জীবন-সঙ্গিনী! যার সাথে মিশে আছে হৃদয়-মন! সকল তনু-মন! জীবনের সকল উত্থান-পতনে, জোয়ার-ভাটায় যিনি পাশে থাকতেন! আহা, আজ নিজ হাতে তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করার ক্ষমতা ও হিম্মত কার কোত্থেকে আসবে?

কিন্তু আল্লাহ্‌র এ-প্রিয়বান্দার কথা একটু ভাবুন তো! নিজ হাতে দাফন করেছেন তিনি সে-ই তেইশ-চব্বিশ বছরের প্রিয়তমা আদর্শ জীবন-সঙ্গিনী খাজিদাকে! ধৈর্যে বুক বাঁধলেন তিনি। সঁপে দিলেন নিজেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে!

আপনাদের কারো ব্যথা, কারো শোক কি এরচে'ও বেদনাদায়ক ও শোকাবহ?

তাঁর কলিজায়ই যখন পাথর রাখতে হয়েছে, যাঁর সন্তুষ্টি স্বয়ং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, তাহলে আমরা আর কোন্ কাতারে গণ্য হবো?

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.

'তোমার পালনকর্তা সত্ত্বরই তোমাকে দান করবেন অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হবে'। -দুহা: ৫

সান্ত্বনা যদি লাভ করতে হয় তাহলে বড়দের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই লাভ করতে হবে। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর পরিসরের কথা নাই-বা ধরলাম, পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ ও বালা-মুসীবতেও তাঁকে বাদ দিয়ে আর কার জীবনাদর্শ আঁকড়ে-ধরে খুঁজে পাবেন সান্ত্বনা?

দাম্পত্য জীবনের আরেকটি বেদনাদায়ক ঘটনা

উপরের ঘটনার পাশাপাশি আরেকটি ছবিও কম মর্মভেদী নয়! যে-স্বামী কুল-মাখলুকের গর্বের পুঁজি, সে-স্বামীর বিচ্ছেদ-ব্যথা কিভাবে সইবে যুবতী স্ত্রী? কিভাবে শান্ত করবে তার অশান্ত মন?

আসুন, আরেকবার ফিরে যাই সেই বিশ্ব দাওয়াখানা ও চিকিৎসা কেন্দ্রে। আম্মাজান যয়নব, উম্মে সালামা এবং অন্যান্যদের কথা না-ই ধরলেন। স্বামীর সাহচর্য ও সান্নিধ্য-পিয়াসী, স্বামীর আদর-মমতা ও ভালোবাসার অনুরাগী সে-ই অল্পবয়সী মা আয়েশা সিদ্দীকার জীবনে কী বয়ে গিয়েছিলো? কিভাবে কুলালো তাঁর ধৈর্যে? তাঁর নির্মল চরিত্রের উপর জঘন্যতম অপবাদ চাপিয়ে দেয়ার পর তাঁর উপর দিয়ে যে কঠিন সময় অতিবাহিত হয়েছে— তা কি মা-হাওয়ার অন্য কোনো মেয়ের জীবনে কখনো এসেছে? কারো জীবনে এমনটি ঘটে থাকলে কিংবা সামনে ঘটলে চিন্তাগ্রস্ত হবেন, বেদনাহত হবেন একজন স্বামী, —যে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে তার স্ত্রীকে— এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওখানে তো যে-স্বামীকে শোক পোহাতে হচ্ছে তিনি কোনো সাধারণ স্বামী নন! আল্লাহ্‌র রাসূল তিনি! সব নবী-রাসূলের সরদার তিনি! নবুওতের পুণ্যধারা সমাপ্তকারী —'খাতামুন-নাবিয়্যীন'— তিনি! তাই এই দুঃখ ও মর্মবেদনার কোনো চিকিৎসা, কোনো প্রতিকার কল্পনা করাও কি সম্ভব?

যে সকল স্ত্রী আজ স্বামী শোকে ভীষণ শোকাকুল, তারা যেনো মা আয়েশার শোক বন্যার পাশে নিজেকে একটু কল্পনা করে নেন। ইনশাআল্লাহ, শোকোচ্ছ্বাস-ঘেরা হৃদয়ে বয়ে যাবে স্বস্তি ও প্রশান্তির হিমেল হাওয়া।

সন্তান-সন্ততির শোক

স্বামী-স্ত্রীর শোকের পর হৃদয় বিদারক শোক হয় সন্তান-সন্ততির শোক। কারো শরীরে যদি গরম গরম লোহা দিয়ে দাগ দেয়া হয়, অতঃপর তাকে কড়া ভাষায় বলা হয়— 'সাবধান! কোনো রকম আহ্-উহ্ করবে না! চীৎকার দেবে না!' তাহলে তার পক্ষে সে সময়টা কতো কঠিন হবে? তার উপর দিয়ে কি অগ্নিঝড় বয়ে যাবে না?

যাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছিলো দীন-দুনিয়ার মুকুট, নিজ হাতে তিনি শেষ পুত্র ইবরাহীমসহ অন্যান্য প্রিয়তম সন্তানদেরকে গোসল দিলেন, কাফন পরালেন, দাফন করলেন! যিনি গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্যে করুণা ও রহমতের আধার, জানের শত্রুর তরেও যিনি দয়া-মায়ার মূর্ত প্রতীক, নিজ সন্তানদের ব্যাপারে কি তাহলে তিনি পাষাণ-হৃদয় .. পাথরদিল ছিলেন? তাঁর হৃদয়ের মায়া-মততা ও প্রেম-ভালোবাসা কি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো? আসলে তাঁর হৃদয়ব্যাপী কী ঝড় যে বয়ে যাচ্ছিলো, তা কেবল ঐ হৃদয় যার, তাঁর এবং তাঁর হৃদয়ের-স্রষ্টা ও মালিক যিনি, তাঁরই জানা ছিলো! খাদেম এবং নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা শুধু দেখেছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ছোট্ট কলিজার টুকরোর মুখের উপর মুখ রেখে স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের একজন পিতা —আমাদের সকলের পিতা— সমানে চুমু খাচ্ছেন! মৃত্যুর অব্যবহিত পর যখন নিজ হাতে তাকে দাফন করলেন, কবরে রাখলেন, দু' চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা! আর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শোনা গেলো এই কথাগুলো— 'ইবরাহীম! তোমার শোকে আমি কাঁদছি'!

আজ পৃথিবীর কোন্ পিতা নিজের মুসীবতকে এরচে' বড় মুসীবত বলতে পারবেন? মক্কার কাফির-মুশরিকরা, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কতোদিন তাঁকে এই বলে বিদ্রূপ করেছে, উত্যক্ত করেছে, অপমান করেছে—

'এ কেমন নবী! পুত্রসন্তানের সিলসিলাই যার বন্ধ হয়ে গেছে?'

কয়েকজন কলিজার টুকরোর মুত্যুশোক কাটতে-না-কাটতেই শেষে বিদায় নিলো এই সর্বশেষ পুত্র সন্তানও!
কার মুসীবত এই মুসীবতের চেয়ে বড়?
কার শোক-ব্যথা এরচে' মর্মভেদী?!

জওয়ান সন্তানের শোক

সন্তান-সন্ততি শৈশবেই সব ইন্তেকাল করেন নি। রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম ছোট থেকে বড় হয়ে পরিণত বয়সে —পর পর দু'জনই হযরত উসমানের স্ত্রী হয়ে— দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবতাকে চিরস্থায়ী জীবনের পয়গাম শোনাতে, তিনি স্বচক্ষে দেখলেন আপন কন্যা সন্তানের ইহজীবন-সমাপ্তি। নিজ হাতে দাফন করলেন তাদের লাশ। এর পরেও এমন কে আছে, যে নিজের জওয়ান কন্যা সন্তানের মৃত্যুতে নিজেকে সবচে' বেশী শোকার্ত ভাববে? আসুন! আপনার কলিজা যখমি হয়ে থাকলে প্রশান্তি ও আরাম লাভের মলম এ-নির্ভেজাল ও নির্ভুল দাওয়াখানা থেকেই হাসিল করুন! দেখবেন— শোক-যখমে সান্ত্বনার কী হিমেল প্রলেপ!!

প্রিয়জন এবং আত্মোৎসর্গীদের শোক

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শোকের পর অন্যান্য প্রিয়জন ও বিশ্বস্তদের ওফাত হয় শোকাবহ। উম্মতের ভিতরে কেয়ামত পর্যন্ত যাদের হৃদয় হবে শোকে শোকাকুল, তারা আসুক এবং তাঁর নমুনা দেখে ধৈর্য ধরুক।
আবু তালিবের মৃত্যুশোক, প্রিয়জন ও আত্মোৎর্গীদের মৃত্যুশোক এবং শহীদানে ওহুদের মৃত্যুশোক— তাঁকে ধৈর্যহারা করতে পারে নি। রাসূলের শোকের পাশে কে নিজের শোককে একক ও অদ্বিতীয় ভাবতে পারে? তাঁর দুঃখ-বেদনার পাশে নিজের দুঃখ-বেদনাকে কল্পনা করে কে খুঁজে পায় না সান্ত্বনা? লাঘব হয় না কার শোক-বেদনা?!

দুঃখ-কষ্ট এবং দারিদ্র্য

মৃত্যুশোক থেকে একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। দেখবেন, পরের ক্রমিক আসছে দারিদ্রের। উম্মতের এক বিরাট জামাত জীবিকা নির্বাহ ও

খাদ্য তালাশের চিন্তায় অস্থির, বে-দিশা। দোষারোপ করছে তারা নিজেদের ভাগ্যকে। উম্মতের এই দুঃখী কাফেলাকে সু সংবাদ প্রদান করুন যে, এই সুশোভিত পৃথিবীর সৌন্দর্য ঝলকে একটু দৃষ্টি মেলে দেখুন তো! যাঁকে আমিরের আমির, সরদারের সরদার বানিয়ে পাঠানো হয়েছে তাঁর কী অবস্থা? কিভাবে কেটেছে তাঁর দিন? কতো খাবার-বেলা গড়িয়ে গেছে, অথচ তাঁর ঘরের চুলায় আগুন জ্বলে নি! ক্ষুধার সুতীব্র দহন সইতে না পেরে পাথর বেঁধেছেন পেটে! এক সঙ্গে হয়ত তিনদিন পেটপুরে তৃপ্তিভরে খাওয়ার সুযোগ কখনো আসে নি তাঁর জীবনে! এই দারিদ্র্যের চেয়ে কার দারিদ্র্য বেশী 'দরিদ্র'? কেউ কি এমনভাবে কোনোদিন ক্ষুধার্ত হয়েছে যে তাকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছে এবং ক্ষুধার তীব্র দহন সয়েও কাজে কর্মে লেগে থাকতে হয়েছে?

হে উম্মতের দারিদ্র-পীড়িত ক্ষুধার্তরা!

রাসূলের আহবানে সাড়া দাও!

লাব্বাইক বলে দৌড়ে যাও!

তাঁর চেয়ে দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষী আহ্বানকারী কোথায় পাবে তোমরা!!

দৈহিক নির্যাতন

এবার ধরুন সেই উম্মতির কথা, যে পীড়িত, দুঃখিত, ব্যথাহত। যার দেহ চিকিৎসকের করুণাপ্রার্থী। সে লক্ষ্য করবে— আত্মার আরোগ্যদানকারী এবং চারিত্রিক অসুস্থতা নিমেষেই যিনি ভালো করে তোলেন স্বয়ং সেই মহা চিকিৎসকও দৈহিক যাতনা ও কষ্ট থেকে বাঁচতে পারেন নি।

বিষ তাঁকেও পান করানো হয়েছে।

সে বিষের প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়েছে আমৃত্যু।

তীরবিদ্ধ হয়েছে তাঁর দেহ।

শহীদ করা হয়েছে তাঁর দান্দান মুবারক।

তাঁর নূরানী বদন থেকেও ঝরেছে বেগবান তাজা রক্ত।

তিনিও সহ্য করেছেন জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপ, যা ধৈর্যশীল সহনশীল আল্লাহ্র এই নবীকেও কাবু করে ফেলেছিলো। ওফাত-পূর্ব রোগ-শয্যায় তাঁর মাথা ব্যথা ছিলো তাঁর মাথারই অনুরূপ।

কোন্ সে দুঃখ-বেদনা ও জ্বালা-যন্ত্রণা, যার আরোগ্যের ঔষধ পাওয়া যাবে না— এই নববী দারুশ শিফায়? নবীর চিকিৎসা কেন্দ্রে?

মাতৃপিতৃহীন হওয়ার বেদনা—পিতা-মাতার শোক

মাতৃপিতৃহীন-এতিম-অনাথ হওয়ার বেদনার চেয়ে বড় বেদনা আর কী হতে পারে? এ-সময়ের চেয়ে নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের কঠিন সময় কি আর আছে? সারা পৃথিবীর বাবা-হারা, মা-হারা অসহায় নিঃসঙ্গদের জন্যে এ হচ্ছে এক সুসংবাদ যে, যিনি সারা দুনিয়ার এতিমদের মাথায় স্নেহ-পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজেও এতিম হয়েই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি এতিম হন নি। পাঁচ বছর বয়সেও নয়। পিতার স্নেহ-মধুর-আকৃতিই তিনি দেখতে পান নি। এক লমহার জন্যেও তিনি বুঝতে পারেন নি বাপের স্নেহ-ভালোবাসা কেমন হয়?

বাপ-হারা ছেলেকেই সাধারণত এতিম বলে। কিন্তু তিনি তো শুধু বাপ-হারা এতিম নন! জীবন শুরুর আগেই বঞ্চিত হয়েছেন তিনি পিতৃস্নেহ থেকে। আর পৃথিবীর আলো বাতাস এবং মাটি ও মানুষকে বোঝার আগেই হারিয়েছেন মা'কে। এক সাথে বাপ-হারা, মা-হারা!!

হে পৃথিবীর এতিমরা! দুঃখ কেনো?
কোন্ দুঃখে তোমরা কাঁদছো?
মুছে ফেলো চোখের পানি!
আনন্দ করো!
গর্ব করো!
চোখে-মুখে ফুটিয়ে তোলো আনন্দ ও গর্বের ঝিলিমিলি আভা!
জানো না বুঝি, কার সারিতে তোমরা দাঁড়িয়েছো?
তোমাদের রাজা যিনি তিনি যে নবীদেরও 'রাজা'!!

কলজে-পোড়ানো সমালোচনা

কারো তিক্ত কথা ও সমালোচনার ভয়ে, কারো নিন্দা ও অপমানের ভয়ে যারা ভীত, তাদের বলছি, এই মহা মানবের জীবনাদর্শ একটু সামনে রাখুন! যার সহযোগী ও বন্ধু (পৃষ্ঠপোষক) ছিলো জিবরীল আমীনসহ আসমানের সকল ফেরেশতা, তাঁকেও তো ওহুদ ও হোনায়নের ময়দানে ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মুকাবিলায় পরাজয়ের মুখ দেখানো হয়েছিলো! হোক না

তা কোনো গূঢ় মঙ্গল ও কল্যাণের কারণেই! ন্যায় ও সত্যের দুশমনরা (বিজয়োল্লাস-মত্তরা) সেদিন সীমাহীন বেদনাদায়ক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক উক্তি করতেও ছাড়ে নি।

নিঃসন্তান হওয়ার অপবাদ, সে কি মামুলি অপবাদ! সে কি সহজে সহ্য করা যায়? তারপরও কাউসারের অধিপতিকে তা শুনতে হয়েছে। বরদাশত করতে হয়েছে।

সত্যবাদী উম্মতের জন্যে তাঁর পবিত্র জীবনের এই অধ্যায়গুলো কি একেবারেই অর্থহীন?!

ঘরোয়া সমস্যা

কেউ একক স্ত্রীর স্বামী হলে তার পূর্ণ হক ও অধিকার আদায় এবং তার সাথে সর্বদা মায়াময় ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা, সব ব্যাপারে তাকে মানিয়ে চলাই বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ একই সময়ে যার দু'তিনজন নয়, ন'জন স্ত্রী হয়, তাদের সবার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে খুশী ও সন্তুষ্ট রাখা কি কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? যারা বিবেক-বুদ্ধির মাথা খেয়েছে, কেবল তারাই বলে, বলতে পারে— 'এ এক বিলাসী জীবনের চিত্র'।

এক আল্লাহ্‌র কসম! এ-জীবন-চিত্র ছিলো সীমাহীন মুজাহাদা এবং নফস ও প্রবৃত্তি প্রদমনের সাধনা-সংগ্রামে ভরপুর। এ-সব স্ত্রীদেরকে তো আর জান্নাতের হূর কিংবা ফেরেশতা বানিয়ে পাঠানো হয় নি! তাঁরাও ছিলেন মাটিরই তৈরী মানুষ! তাঁদেরও ছিলো মানবিক চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। খাওয়া-পরার প্রতি তাদেরও ছিলো মানবিক দুর্বলতা ও আকর্ষণ। নারীর স্বাভাবিক মন-মানসিকতার বিচারে তারাও সতীন-ঈর্ষার উর্ধে ছিলেন না। এ-হৃদয়ের গহীনেই প্রচ্ছন্ন থাকে মান-অভিমান। কখনো চলে ভালোবাসার অর্থপূর্ণ চোখাচোখি। ফিসফিসানি, কানাকানি। কখনো কথা বাড়ে। সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য। নবীজীর কান পর্যন্ত তা গিয়ে পৌঁছে।

নবীর সেই ছোট্ট বরকতময় ঘরে অভাব-অনটনের যে ছাপ ছিলো, তা সুবিদিত। স্পষ্ট ভাষায় সে পুণ্যাত্মা বিবিগণকেও দেয়া হয়েছিলো দীন অথবা দুনিয়া বেছে নেয়ার অধিকার। কিন্তু তারা-যে বিশ্ব নবীর সহধর্মিণী!

তাই একজনও এ-অধিকার থেকে ফায়দা ওঠানোর কথা ভাবতে পারেন নি। আখেরাত বেছে নেয়ার প্রতিযোগিতায় সবার আগে ছিলেন 'ছোট্ট' আয়েশা রা.!!

বিবি-বাচ্চার ঝঞ্ঝাটে আটকে-পড়া উম্মতির দল!

পারো না কি এখান থেকে কোনো সবক নিতে?

মর্মঘাতি অপবাদ

কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সতী ও পুণ্যবতী স্ত্রীর উপর যদি সামান্যতম দোষও চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে দেখতে পাবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। আপনারাই বাস্তবতার আলোকে একটু কল্পনা করে নিন। এখন এ-সম্মানিত স্বামীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন! যাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সম্মান, মর্যাদা, পবিত্রতা ও লজ্জার মূর্তিমান আদর্শ বানিয়ে।

এবার একটু ভেবে দেখুন, তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণীর কথা। যার আনত লোচনই সাক্ষ্য বহন করে— তাঁর লজ্জা, পবিত্রতা ও সতীত্বের। যাঁর সততা ও ওফাদারির সাক্ষ্য পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। একমাত্র হযরত মরিয়ম ছাড়া মা-হাওয়ার আর কোনো কন্যা কি এ-সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছে? নির্বোধ লোকেরা যখন তাঁর শিশির ধোয়া, দুধ-সাদা নির্মল চরিত্রের উপর কথা বলে নাপাক করলো নিজেদেরই মুখ, তখন পবিত্রতা ও সতীত্বের সেই জীবন্ত ছবির উপর দিয়ে, লজ্জা ও হায়া, নিষ্কলুষতা ও নির্মলতার সেই 'তাসবিরের' উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গিয়েছিলো? কিন্তু তিক্ত ও বিষমাখা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে হলেও সকল কালের সকল যুগের মুসলিম নর-নারীকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা লাভের কী গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য শিক্ষাই-না তিনি দিয়ে গেলেন!

ধন্য তুমি হে ছোট্ট বয়সের বড় আয়েশা!

নবীজীর ঘরোয়া জীবনকে কী সুন্দর ও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছো তুমি যুগ-যুগ ধরে উম্মতের সামনে– যতো না তাঁর জীবদ্দশায় তারচে' বেশী তাঁর ওফাতের পর!! এখানেই বুঝি লুকিয়ে ছিলো অল্প বয়সে তোমার 'উম্মুল মু'মিনীন' হওয়ার রহস্য?!

জীবনের ঘটনা প্রবাহ, যেখানে রয়েছে সর্বব্যাপী সান্ত্বনা

মোটকথা; ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে মানুষের দুঃখ-বেদনার, শোক-ব্যথার সম্ভাব্য প্রতিটি দিককেই সামনে রাখুন, যে কোনো ব্যথার ঔষধ, যে কোনো যখমের মলম এবং যে কোনো বিয়োগান্ত ও মর্মভেদী ঘটনার পর 'সান্ত্বনা' যদি কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে পাওয়া যাবে শুধু এই মুহাম্মদী দারুশ-শিফায়। রুহানিয়াতের অন্যান্য দিক এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতার অন্যান্য দলিল-প্রমাণ থেকে নজর সরিয়ে শুধু এই দিকটির সর্বব্যাপিতার কথাই ধরুন, তার নজির আগে-পরের কারো মধ্যে —তা প্রাচ্যে কিংবা প্রতীচ্যে, উত্তরে কিংবা দক্ষিণে হোক— মিলবে কি? যে কোনো নিদারুণ ও সাংঘাতিক মুসীবতের সময় আত্মপ্রশান্তি লাভের 'আদর্শ' রয়েছে তাঁর জীবনে। নিজের সম্পর্কে কী চরম সত্য কথাই-না বলে গেছেন তিনি, 'আমিই নবুওত প্রাসাদের সর্বশেষ ইট'। প্রাসাদ নিঃসন্দেহে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ, সুসজ্জিত। কিন্তু সর্বশেষ এই ইটটির স্থান-শূন্যতার কারণে সে প্রাসাদে আসছিলো না সর্বব্যাপিতা ও নিখুঁত পরিপূর্ণতা।

অসংখ্য দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি, যিনি পূর্ণকে পরিপূর্ণ করে, সম্মানিতকে অতি সম্মানী করে, মহানকে অতি মহান করে, গুণীকে মহাগুণী করে এবং সুন্দরকে সুন্দরতম করে— দুর্বল, দুঃখী, দরিদ্র, অসহায়, অসুস্থ এবং শোকাহত উম্মতের সান্ত্বনা লাভের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থাপন করে গেছেন এক চিরন্তন আদর্শ।

প্রিয়তমের তিরস্কার

দৃশ্যপট

একবার আল্লাহ্‌র নবী এক মজলিসে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন সেখানে এসে হাজির হলো কোরাইশ গোত্রের একদল দাম্ভিক ও অহংকারী নেতা। এদের ভিতর ছিলো আবু জেহেল, শায়বা, উমাইয়া আরো অনেকে। বলা বাহুল্য, ইসলাম কবুল করার চেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে অধিকতর প্রিয় জিনিস আর কী হতে পারে? দিবা-নিশি সর্বক্ষণ এ-চিন্তায়ই তো তিনি থাকতেন ব্যাকুল-অস্থির! তাই এ রকম একটা সুযোগ হাতে এসে যাওয়া নবীজীর ধারণায় কেবল সুবর্ণ সুযোগই নয়— রীতিমত মহাদান। তাছাড়া এরকম সুযোগ ক'বারই বা পাওয়া যায়? কেননা এরা তো রাসূলের কোনো কথা কখনো কানে তুলতেই রাজি ছিলো না। তাই তিনি তাদের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দিলেন।

আল্লাহই জানেন! রাসূলের মনে ছিলো কতো আশা! এদের ভিতরে একজনও যদি ইসলাম কবুল করে, তাহলে তার সাথে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়বে আরো কতো মানুষ! এরা যে দলপতি—নেতা!!

ঠিক ঐ মুহূর্তেই সেখানে উপস্থিত হলেন অন্ধ এবং দৃশ্যতঃ অতি সাধারণ পর্যায়ের এক সাহাবী। এসেই জিজ্ঞাসা শুরু করে দিলেন তিনি। এ-'বেচারা' কি আর জানতেন— কারা বসে আছে এখানে?

এদিকে কোরাইশ দলপতিদের মন-মানসিকতা কারো অবিদিত নয়। নিজেদের মর্যাদাবোধ ও 'প্রেষ্টিজ'-এর নেশায় তারা উন্মাদ।

বদর প্রান্তরে মুকাবিলার জন্যে প্রথমে 'আনসার' এলে তারা এই বলে লড়তেই অস্বীকৃতি জানালো যে, তোমরা তো আমাদের সমকক্ষ নও! তোমাদের সাথে কেনো লড়াই করবো? ময়দানে কোরাইশ গোত্রের লোকেরা এলেই তবে লড়াই হবে!

বদর যুদ্ধে যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলো আবু জেহেল, তখনও হত্যাকারীর কাছে করুণা ভিক্ষা করে নি সে। বরং জিজ্ঞাসা করেছিলো— কে তুমি আসলে? জওয়াবে যখন 'আনসারী' শব্দটি এসে তার কানের

পর্দায় আঘাত করলো, তখন দুঃখ ও আক্ষেপভরা কণ্ঠে উচ্চারিত হলো এ-কয়টি শব্দ—

'হায়! মক্কার কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি আমার গলা কাটতো! আফসোস! আজ আমার মৃত্যু হচ্ছে একটা চাষার হাতে'!

এই ছিলো কোরাইশ দলপতিদের মন-মানসিকতা। তাই হঠাৎ করে তাদের মাঝে এক অন্ধের 'অনুপ্রবেশে' এবং 'তার অনধিকার চর্চায়' (তাদের ধারণা মতে) এ-মন-মানসিকতা লালনকারীদের ভিতর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে— তা স্পষ্ট।

এই লোকগুলোর ইসলাম গ্রহণের প্রতি আল্লাহ্‌র নবীর চেয়ে অধিকতর আকুল আর কে হতে পারেন? ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র নবীর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের মামুলী প্রশ্ন বিরক্তিকর লাগা ছিলো একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার।

এবার আয়াত পড়ুন এবং প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবিকে সামনে রেখে আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করুন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. أَن جَاءَهُ الأَعْمَى.

'তিনি (তার বিশেষ মজলিসে) ভ্রু-কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তার কাছে এক অন্ধ এসে হাজির হয়েছে'। -আবাসা: ১-২

الأَعْمَى শব্দটি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যে এখানে বলা হয় নি। এ-শব্দটি এখানে এনে সে অন্ধ সাহাবীর পক্ষে বরং সাফাই পেশ করা হয়েছে যে তাঁর এই প্রবেশ ছিলো অনিচ্ছাকৃত বা পরিস্থিতির অজ্ঞাতসারে।

তাবলিগের দাবি

সরওয়ারে দোজাহান এ-সুযোগে এবং এ-পরিস্থিতিতে এ না করলে আর কী-ইবা করতে পারতেন? যে-কোনো দাওয়াত প্রচারক এমন সুযোগে আর কী করতেন? সেই বড় বড় প্রভাবশালী সরদারদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাব্য এ-সুযোগকে হাতছাড়া করে তাদের কেউ কি খুশী হতে পারতেন?

আনুষঙ্গিক প্রশ্ন

তারপর সে-সাহাবী বেশীর চেয়ে বেশী আর কী-ইবা জিজ্ঞাসা করতেন? (আল্লাহ্ না করুন) তাওহিদ ও রিসালাতের ব্যাপারে কি তার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো? পরকাল সম্পর্কে কোনো দ্বিধা?

আল-হামদুলিল্লাহ্! মু'মিন তো তিনি ছিলেনই। যা-ই জিজ্ঞাসা করতেন দীন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কোনো বিষয় পর্যন্তই তা সীমিত থাকতো। কিন্তু এদিকে কোথায় দীন সম্বন্ধে কাউকে কোনো আনুষঙ্গিক বিষয় বলে দেয়া, আর কোথায় কাফির-মুশরিকদের দলপতিদেরকে ইসলামের গণ্ডির ভিতরে আনার সম্ভাব্য সুযোগের কদর করা। দু'টি বিষয়ের গুরুত্বের ভিতরে কি তুলনা চলতে পারে? সেই সাথে এ-কতিপয় কাফির-মুশরিক দলনেতার ইসলাম গ্রহণ যদি শত শত মানুষের ইসলাম কবুলের কারণ ও মাধ্যম হয়— তাহলে?

আল্লাহ্র নবীর চেয়ে কম আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অন্য মুবাল্লিগ হলে এ-সময়টা তো এমন ছিলো যে, তিনি মোটেই আত্মসম্বরণ করতে পারতেন না। রাসূল নিজেও যদি এ-মুহূর্তে কথায় কাজে কোনো কঠোর আচরণ করতেন, তবুও তা মানব-প্রকৃতি ও স্বভাবের দৃষ্টিতে অন্যায় ও অসঙ্গত হতো না।

মানব-প্রকৃতির বিচারে বলবো কেনো? নববী দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও কি তা সঙ্গতিপূর্ণ হতো না? কোনো নবী কি এমন ছিলেন, যিনি সত্যের পথে অন্তরায় ও বাধা লক্ষ্য করে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, তাঁর দীনের জন্যে রাগ ও উত্তেজনায় টগবগ করে উঠতেন না?

কিন্তু এখানে? সহনশীলতার মূর্ত প্রতীকের পক্ষ থেকে তেমন কিছুও তো প্রকাশ পায় নি! ব্যাপারটি তো ভ্রু-কুঞ্চন ও ভ্রূক্ষেপ না করার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়! আর সে-সাহাবী ছিলেন দৃষ্টিহীন, অপারগ, তিনি দেখতেই পান নি। তাই মনোকষ্ট ও ব্যথা পাওয়ার প্রশ্নও এখানে আসে না।

মোটকথা; 'মুবাল্লিগে আজম' যা করেছেন, তার বাইরে অন্য কিছু করা কোনো মানুষের পক্ষে, এমন কি কোনো পয়গাম্বরের পক্ষেও সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু এখন শুনুন তাঁর কথা, যিনি মানুষ নন, মানুষের স্রষ্টা। যাঁর কাছে মানুষের দৃশ্য-অদৃশ্য সবই বরাবর।

মানব মস্তিস্কের ব্যাখ্যানুসারে অনুধাবন করে যান তাঁর বাণী।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.

'তুমি কি জানো? হয়ত সে হতো পরিশুদ্ধ' আর .... -আবাসা: ৩

হে পয়গাম্বর! তুমি অদৃশ্যের খবর কী-ইবা জানো? এটাও তো সম্ভব ছিলো যে, আমার ইলমে গায়েবে এটাই ফায়সালা হতো যে, সে সাহাবী তোমার সে সময়কার দৃষ্টি লাভ করতে পারলে পরিপূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হতে পারতো! পরিশুদ্ধ তো ছিলোই সে। এখন পরিপূর্ণরূপে সে নিজেকে সাজাতো। হাসিল করতো পূর্ণ পরিশুদ্ধি।

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى.

'অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হতো'। -আবাসা: ৪

কিংবা এও তো হতে পারতো যে, যে-বিশেষ ব্যাপারে সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলো, সে ব্যাপারে যথাযথভাবে তোমার উপদেশ পালিত হতো। সে লাভ করতো আত্মতৃপ্তি।

'ইজতিহাদে নববী' নিঃসন্দেহে এখানে সঠিক হিসাবে চিহ্নিত হয় নি। কিন্তু কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে? কোন্ মাপকাঠিতে? কোনো মানুষ, প্রকৃতি, সমগ্র সৃষ্টিলোক, এমনকি পয়গাম্বরী মাপকাঠিতেও নয়— সে শুধু, শুধু এবং শুধুই মানব-ক্ষমতা ও দৃষ্টি থেকে অনেক উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র মাপকাঠিতে !

ইরশাদ হচ্ছে— 'তোমার জায়গাতে তোমার ইজতিহাদ সম্পূর্ণ সঠিক। নিঃসন্দেহে কাফির-মুশরিকদের অসুস্থতার প্রতি নজর দেয়া অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যাপারটির তো আরেকটি দিকও ছিলো! কোরাইশ সরদারদের অসুস্থতা লাখো গুণ গুরুত্বের দাবি রাখে ঠিক, আর এও ঠিক যে, প্রত্যেক চিকিৎসকই সর্দি-কাশি রোগে আক্রান্ত রোগীর বদলে কলেরা প্লেগ আক্রান্ত রোগীর প্রতিই আগে দৃষ্টি দেবে। কিন্তু এখানে এ-বিষয়টিও তো মনে রাখতে হবে যে, সেই হতভাগারা চিকিৎসাপ্রার্থীই বা ছিলো কবে? লক্ষ্য করুন কুরআনী আয়াত—

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى.

'আর যে বে-পরোয়া, তুমি তার চিন্তায় মশগুল'। -আবাসা: ৫-৬

استغناء (বে-পরোয়া হওয়া)-র কারণে তারা নিজেদেরকে অসুস্থ ও চিকিৎসাপ্রার্থী মনে-ই বা করছিলো কই? তারা তো উল্টো বিমুখতা এবং 'পালিয়ে গেলেই বাঁচি' ভাব দেখাচ্ছিলো!

সত্যান্বেষণের ব্যাপারে তারা ছিলো অসন্তুষ্ট। ক্রুদ্ধ। তারা তালাশ করছিলো তোমার কাছ থেকে সরে পড়ার ও পালিয়ে যাওয়ার বাহানা। (অথবা তোমাকে বেকায়দায় ফেলার কোনো সূত্র)। সুতরাং তুমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়লে আল্লাহ তা'আলার অহং ও মর্যাদাবোধ কিভাবে তা সহ্য করতে পারে? তারা ইসলাম কবুল করুক আর না করুক। পরিণাম ফল ওদেরকে ভোগ করতেই হবে।

এ কথা সত্যি যে, তোমার এই কাজের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিলো সংশোধন-সংস্কার এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর উপরই। কিন্তু তাবলিগ ও দাওয়াতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এতো গুরুত্ব প্রদানের দায়িত্ব তোমার কাঁধে কবেই বা অর্পিত হয়েছিলো? তোমার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেয়া? তারা না শুনলে তোমার কী এসে যায়?!

وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى.

'সে শুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দোষ নেই'। -আবাসা: ৭

পরিণাম ফল নির্ণয় ও ফলাফল প্রকাশ— সেতো সম্পূর্ণ আমার দায়িত্বে! তারা তোমার কথা না মানলে তাতে তোমার কী? কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হবে না তোমার বিরুদ্ধে! তুমি কেনো চিন্তায় পড়তে যাবে?! আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার প্রতি তুমি ভ্রুক্ষেপ করো নি, মেনে নিচ্ছি তার অসুস্থতা লাখো গুণ হাল্কা। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতি নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক কম।

وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى. وَهُوَ يَخْشَى. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى.

'আর যে তোমার কাছে দৌঁড়ে এলো, এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে (আল্লাহকে) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে'। -আবাসা: ৮-১০

কিন্তু এটাও তো লক্ষ্য রাখবে যে, সে সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে, আরোগ্য লাভের আশা ও বাসনা নিয়ে, নিজেকে রুগীর কাতারে শামিল করে আর তোমাকে চিকিৎসক ভেবে ছুটে এসেছে! তার হৃদয়ে বিমুখতা ছিলো না, ছিলো আল্লাহ্‌র ভয়। তোমার কাছ থেকেই নিতে এসেছিলো সে আরোগ্য লাভের নুসখা ও ব্যবস্থাপত্র। তারপরও কি তোমার দৃষ্টি লাভের অধিকারী সে হতে পারে না?

তার ব্যাপারটি অগ্রগণ্য ও অগ্রাধিকারযোগ্য হওয়াতে কি কোনো বাধা আছে? যাক, ঘটনা যা ঘটবার, তা তো ঘটেই গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে এমনটি আর না ঘটে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে।

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ.

'কক্‌খনো এরূপ করবে না। এটা উপদেশ-বাণী, যার ইচ্ছে সে উপদেশ গ্রহণ করবে'। -আবাসা: ১১-১২

'কালামে মজীদ' জোরপূর্বক কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। এতো শুধু নসীহতের কিতাব। যার ইচ্ছে হয় আনন্দচিত্তে তা কবুল করবে, আর যে এদিকে ভিড়তে না চায় সে পালিয়ে বেড়াক। অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে কোনো ক্রমেই সে রেহাই পাবে না।

এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর আল-হামদু লিল্লাহআল্লাহ্‌র নবীর কর্ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মনে হবে বলে আশা করি।

কমপক্ষে এই অধ্যায়ে কোনো জটিলতা থাকবে বলে মনে করি না।

জন্মকাল সম্পর্কিত রিওয়ায়াত

পবিত্র কুরআনে কিছু সংখ্যক আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সাথে তাঁদের এবং সংশ্লিষ্টদের কারো কারো জন্ম-বৃত্তান্তও উল্লিখিত হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত সূচীর প্রথম নাম হযরত আদম আ.-এর। তাঁর জন্ম ছিলো অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর এক বিরল সমষ্টি যা সৃষ্টিলোকের সাধারণ নিয়ম-নীতির সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে পিতা-মাতা ব্যতীত। তারপর ফেরেশতাগণ কর্তৃক তাকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন ইবলিস তাঁকে সিজদা করতে অস্বীকার করে হয়ে গেলো চির অভিশপ্ত।

হযরত আদম আ.-কে দান করা হয়েছে সমস্ত জিনিসের নাম-পরিচয়ের 'ইলম' ও জ্ঞান। তাঁর জন্মের পূর্বে ফেরেশতাদের সাথে বিশেষ আলোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। আর জন্মের পরই ফেরেশতাদের ইলমের সাথে তাঁর ইলমের মুকাবিলা হয়েছে। বিজয়ী হয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, এ-সব ঘটনা সাধারণ মানুষের জন্মের আগে-পরে পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত আদম আ.-এর জীবন-সঙ্গিনী মা হাওয়ার জন্ম সম্বন্ধে আল-কুরআনে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তবে এতোটুকু উল্লেখ রয়েছে যে,

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ..

'সেই একই নফস থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে'। -নিসা: ১

অধিকাংশ তাফসীরকার যেমন ইবনে জারীর, হাফিজ ইবনে কাসীর ও কাজী বায়যাভীসহ অন্যান্যরা কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইবনে আব্বাস রা.-এর বরাত দিয়ে এ-কথা লিখেছেন যে, তাঁর জন্ম আদম আ.-এর পাঁজর থেকে হয়েছে। এ-বর্ণনা সঠিক হোক আর না হোক, এতোটুকু ইশারা আল-কুরআনেই রয়েছে যে, তাঁর জন্ম প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাইরে হয়েছিলো।

হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মের ব্যাপারে আল-কুরআনে আছে যে, তাঁর জন্মের সুসংবাদ প্রদানের জন্যে দৃশ্যমান হয়ে এসেছিলেন ফেরেশতা। নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জননী প্রত্যক্ষ করছিলেন সে-ফেরেশতাকে এবং তার

সাথে কথাও বলেছিলেন। ফেরেশতা তাঁকে হযরত ইসহাক আ. ছাড়াও হযরত ইয়াকুব আ.-এর জন্মের সুসংবাদও প্রদান করেছিলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত মূসা আ.-এর জন্ম সম্পর্কে তাঁর জননীর কাছে 'ওহী' নাযিল হয়েছিলো। অথচ তিনিও নবী ছিলেন না। সেই ওহীতে এক স্নেহময়ী ব্যাকুল মায়ের বে-কারার মনকে দেয়া হয়েছিলো সান্ত্বনা। বাতলে দেয়া হয়েছিলো হযরত মূসা আ.-এর হিফাযতের এক বিশেষ ব্যবস্থার কথা। তাঁর নিরাপদ থাকার এবং ভবিষ্যতে নবী হওয়ার কথাও তাঁর মাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যা তখনো পর্দার অন্তরালেই ছিলো। তারপর ফেরাউনের ভয়ে সমুদ্রের বুকে তাঁকে ভাসিয়ে দেয়া হলে অলৌকিক উপায়ে তাঁর লালন-প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয়েছিলো খোদ ফেরাউনের প্রাসাদেই। আর তাঁকে দুধ পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিলো খোদ তাঁরই জননীকে। এ-সবই সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে রয়েছে এর আরো বিশদ বর্ণনা। এ-সব ঘটনা ছিলো প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম-নীতির উর্ধের অস্বাভাবিক ঘটনা।

হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্ম হয়েছিলো এমন মুহূর্তে যখন তাঁর মা-বাপ বার্ধক্যজনিত কারণে সন্তান জন্ম দেয়ায় ছিলেন একেবারেই অক্ষম ও আশাহত। তাঁর জননী তো গণ্য হয়েছিলেন বন্ধ্যা হিসাবেই। তারপরও কুদরতের ইশারায় (যেখানে এসে মানব ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায়) ফেরেশতারা উঁচু কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন এ-জন্মের সু সংবাদ।

হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম ছিলো বিরল ঘটনার আরেক বিস্ময়কর সমষ্টি। তাঁর মুহতারামা জননী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন স্বামী ছাড়া। নবী না হয়েও কথা বলেছেন ফেরেশতার সঙ্গে এবং তাঁর কাছে শুনেছেন নিজের ঔরস থেকে একজন প্রেরিত নবীর জন্মের সুসংবাদ। গর্ভ-ধারণকালে তাঁর পাশে প্রবাহিত হয়েছিলো একটি স্বচ্ছ পানির ঝরনা। তাজা তাজা ফল ঝরে পড়েছিলো তাঁর সামনে। কথা বলে উঠেছেন কোলের শিশু হযরত ঈসা। সাক্ষ্য দিয়েছেন মায়ের সতীত্ব ও পুণ্যশীলতার। প্রতিটি ঘটনাই স্ব স্ব স্থানে একেকটি মু'জিযা। শৈশবে খোদ মরিয়মের কাছে খাবার পৌঁছার কথাও তো আল-কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্‌র যতো নেক ও মকবুল বান্দা-বান্দীদের আলোচনা কুরআন শরীফে স্থান পেয়েছে, তাদের সবার ক্ষেত্রেই জন্মের আগে-পরে কিছু অলৌকিক ও

অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ এমন সব ঘটনা ঘটেছে, মানুষের সীমিত অভিজ্ঞতায় যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির প্রতিকুল হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষত হযরত ঈসা আ., হযরত মূসা আ. এবং হযরত ইসহাক আ. এই তিনজনের জন্ম সম্পর্কে তাঁদের জননীদের অদৃশ্যলোকের সুসংবাদ লাভ করা। অথচ এঁদের কেউই নবী ছিলেন না।

এখন যদি নবী-রাসূলদের সরদার এবং পয়গাম্বরদের মাথার মুকুট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের সুসংবাদ ফেরেশতাকুল আনন্দ-উল্লাসে চীৎকার করে করে প্রচার করে থাকেন, যদি এ-সূর্যের উদয়নে আধ্যাত্মিক জগতে খুশি ও আনন্দের বান ডেকে যায়—ধুমধাম পড়ে যায় মহিমময় ঊর্দ্ধলোকে, যদি এ-মূর্তিমান নূরের মহিয়সী জননীর চোখের সামনে ভেসে উঠে অদৃশ্য জগতের আলোকমালা, যদি এই গৌরবান্বিত, সৌভাগ্যবতী খাতুনের কাছে আধ্যাত্মিক জগত ও অদৃশ্যলোকের কিছু সূক্ষ্ম জিনিস উপস্থাপিত হয়ে থাকে— তাহলে এতে কোনো মুসলমানের কি অবাক হওয়া উচিত?!

বলা হয়ে থাকে যে, সহীহ হাদীসে এ-সব বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ নেই, যা সাধারণত 'মিলাদনামা'য় (জন্ম-বৃত্তান্ত-বিষয়ক কিতাবে) পাওয়া যায়।

হাদীসে এ-সব ঘটনার উল্লেখ তো অধিক পরিমাণেই পাওয়া যায়, এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বিমত শুধু এ-নিয়ে যে, এ-সব হাদীস কি 'সহীহ' ও নির্ভরযোগ্য, না 'যঈফ' (দুর্বল) ও 'মওযু' (মনগড়া)? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়ার বা বিষয়টি নিয়ে চর্চা করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই; বরং এ বিদ্যায় যারা বিজ্ঞ ও পারদর্শী, এ কেবল তাঁদেরই হক। আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যসহ দুনিয়ার প্রতিটি বিদ্যা ও বিষয়ের মতো হাদীস ও একটি বিশেষ বিদ্যা ও বিষয়। হাদীসের যাচাই-বাছাই-পরখ এবং দুর্বল হাদীস থেকে সবল হাদীস পৃথকীকরণ কেবল সে-সব মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব, যারা বিশেষভাবে এ-বিদ্যা অর্জনের পেছনে পার হয়েছেন অনেক চড়াই-উৎরাই, ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন নিজের জীবন। যারা মুহাদ্দিস ও হাদীস বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন— সে বিষয়ের ইমামদের কাছ থেকে।

এ কথা সত্য যে, কতিপয় মুহাদ্দিস এ-সব মিলাদী রিওয়ায়াতকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু যে সকল মহান ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করে নিজ নিজ হাদীস ও

সীরাত সংকলনে স্থান দিয়েছেন এবং দলিল হিসাবে তা পেশ করেছেন, তাদের ইলম ও জ্ঞানের গভীরতাকেও কোনোভাবেই খাট করে দেখার উপায় নেই। তাদের বিজ্ঞতা-পারদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টিও সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এমতাবস্থায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে এ-সব রিওয়ায়াতকে একেবারে অস্বীকার করা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত ও সঠিক— তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. উত্তরসূরী-যুগে সম্ভবত এ-ফন ও বিদ্যার ইমাম ও মুকুট ছিলেন। মিলাদ ও জন্ম সম্পর্কিত কিতাবসমূহে তাঁর বরাতও দেয়া হয়ে থাকে। খোদ শাহ সাহেব রহ. ফারসীতে যে মিলাদনামা লিখেছেন, তাতে এ-সব রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করা হয় নি। বরং এগুলোর কোনো কোনো রিওয়ায়াত সেখানে স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন ঃ

'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের রাত্রিতে 'কিসরা'র রাজপ্রাসাদে কাঁপন সৃষ্টি হয়েছিলো, যার আওয়াজ শ্রুত হয়েছিলো এবং চৌদ্দটি থাম খসে পড়েছিলো এবং পারস্যের হাজার বছরের অবির্বাণ অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিলো। শুকিয়ে গিয়েছিলো প্রবহমান ঝরনা'।

এ-রিওয়ায়াত ব্যাপকভাবে মিলাদনামায় বর্ণিত হয়েছে। খোদ শাহ সাহেবও তা গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে এতোটুকুই তো যথেষ্ট এবং সান্ত্বনার কারণ হতে পারে!

আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছর আগে হিন্দুস্তানে শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. নামে হাদীস শাস্ত্রের আরো একজন বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য মনীষী অতিক্রান্ত হয়েছেন। ('তাসাউফে মুহম্মদী'-তে যার কথা আলোচিত হয়েছে) ما ثبت بالسنة (মা সাবাতা বিস্সুন্নাহ) নামে আরবীতে একটি কিতাব লিখেছেন তিনি। কিতাবের আলোচ্যসূচী কী, তা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। মিলাদনামাসমূহে যে-সব বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনা উল্লেখ রয়েছে প্রায় তার সবই স্থান পেয়েছে সে-কিতাবের ৩৭ থেকে ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। যেমন তাঁর জন্মের পূর্বে কোরাইশদের দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া। জন্মের সময় নিকটবর্তী হওয়ার বরকতে ফসলের জমিগুলো সবুজ-শ্যামল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠা, মা আমেনার গর্ভ-ভার অনুভূত না হওয়া, মাসের পর মাস অবিরত সুসংবাদ মিলতে থাকা, প্রসবকালে নূরানী পাখি পরিদৃষ্ট হওয়া, মহাশূন্যে মহিয়সী নারীদের রৌপ্য কুড়াতে দেখা। ভূ-পৃষ্ঠের দিগন্ত

পর্যন্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠা, পূর্ব দিগন্তে, পশ্চিম দিগন্তে ও কা'বার উপরে একটি করে পতাকা উড্ডীন হওয়া, 'কিসরা'র প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি হওয়া এবং চৌদ্দটি স্তম্ভ ধসে পড়া, পারস্যের হাজার বছরের অনির্বাণ অগ্নিশিখা নিভে যাওয়া— ইত্যাদি।

তার মানে এই নয় যে, উক্ত কিতাবে 'কাঁচা-পাকা' সবই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এ লেখকেরই 'আজাইব ওয়া খাওয়ারিকে মীলাদ' (জন্মকালীন সময়ের বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী) নামক অন্য কিতাবের শুরুতে বিদগ্ধ মুসান্নিফ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যে,

و أوردنا من الأخبار ما ورد و صح من الطريق المتعارف في رواية الأحاديث

'হাদীস বর্ণনার সুবিদিত প্রামাণ্য 'সনদ' দ্বারা যে সব রিওয়ায়াত সহীহ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে কেবল সেগুলোই আমি উপস্থাপন করেছি।'

আর শুধু এই কিতাবেই নয় বরং সীরাতে নববী সংক্রান্ত 'মাদারিজু'ন-নবুওত' নামে তিনি দেড় হাজার পৃষ্ঠার যে বিশাল কলেবরের কিতাবটি রচনা করেছেন ফারসী ভাষায়, তাতেও তিনি এ-সব ঘটনাকে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী কর্তৃক এ-রিওয়ায়াত বর্ণিত হওয়া এবং সেগুলোকে তদকর্তৃক সঠিক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করাকে— কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে বলা যায় না।

এ-দুই মনীষীর চেয়েও বড় সাক্ষ্য হলো কাযী 'ইয়ায মালিকীর সাক্ষ্য, যিনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের একজন মশহুর মুহাদ্দিস ও সহীহ মুসলিম শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান হলো এই যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফের ইতিহাসখ্যাত ব্যাখ্যাতাদ্বয় 'আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম নববীসহ আরো অনেকে তাঁর বরাত ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর কিতাব জন্মকাল সম্পর্কিত রিওয়ায়াত "الشفاء في تعريف المصطفى" সম্পর্কে "كشف الظنون" এর মুসান্নিফ বলেন—

هو كتاب جليل عظيم النفع كثير البركة لم يؤلف مثله في فنه في الإسلام

'এটি একটি উঁচু স্তরের কিতাব, অতিশয় তথ্যবহুল ও বরকতপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের কিতাব সংকলিত হয় নি।'

এ-কিতাবের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অংশের শেষ দিকে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে রাসূলের মুবারক জন্মের সময়কার কিছু অলৌকিক নিদর্শনাবলীর কথা। লক্ষ্য করুন নিম্নোক্ত শব্দমালা—

و من ذلك ما ظَهَرَ مِنَ الآيَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِه وَ مَا حَكَتْه أمُّه وَ مَنْ حَضَرَه مِنَ الْعَجَائِب، وَكَوْنه رَافِعًا رَأْسَه عِنْدَمَا وَضَعَتْه، شَاخِصًا بِبَصَره إلى السَّماء، وَمَا رَأَتْه مِنَ النُّوْرِ الَّذِيْ خَرَجَ مَعَه عِنْدَ وِلَادَتِه، وَمَا رَأَتْه إِذْ ذَاكَ أُمُّ عُثْمَانَ بْنَ إِبِيْ العَاصِ مِنْ تَدَنِّي النُّجُوْمِ وَ ظُهُوْرِ النُّوْرِ عِنْدَ وِلَادَتِه حَتّٰى مَا تَنْظُر إلاَّ النُّوْر.....

وَ مَا جَرَى مِنَ الْعَجَائِبِ لَيْلَةَ مَوْلِدِه مِنَ ارْتِجَاجِ إِيْوَانِ كِسْرى وَ سُقُوْطِ شُرْفَاتِه وَ غَيْضِ بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةَ وَ خُمُوْدِ نَارِ فَارِسَ وَكَانَ لَهَا أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَخْمُدْ.

অর্থাৎ 'অনুরূপ মু'জিযার মধ্যে সে সব অলৌকিক নিদর্শন ও বিস্ময়কর ঘটনাও শামিল রয়েছে যা তাঁর জন্মকালে প্রকাশ পেয়েছিলো, যা বর্ণনা করেছেন তাঁর মুহতারামা জননী এবং তাঁর কাছে উপস্থিত যারা ছিলো তারা। যখন তিনি পৃথিবীতে এলেন, তখন তিনি নিজের মাথা (যেন দু'আর জন্যে) উঁচু করে রেখেছিলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আর হযরত উসমান ইবনে ওয়াইল রা. এর জননী প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই দৃশ্য যে, তাঁর জন্মকালে আসমানের সিতারারা কক্ষচ্যুত হয়ে নেমে এসেছিলো এবং তাঁর নিকট থেকে এমন প্রখর ও বিশালায়তন আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটেছিলো যে, তাঁর সামনে সবকিছু আলো ঝলমলে হয়ে উঠে।
আর তাঁর জন্মের রাতে যে সব বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো তা হলো এই যে, কিসরা'র রাজ প্রাসাদে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হওয়া, তার স্তম্ভ ধসে পড়া, 'তবরিয়া সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়া এবং পারস্যের হাজার বছরের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডটি নিভে যাওয়া'।[১]
এ-সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের পারদর্শী ইমাম ও বিচারক। তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন নি এ-সব রিওয়ায়াতকে; বরং গ্রহণ

---

১. الشفاء في تعريف المصطفى

করেছেন নিজেদের সংকলনে। আর বায়হাকী, হাকীম, আবু নুআ'য়ম, তাবারানীসহ অন্যান্য যারা এসব রিওয়ায়াতকে প্রথমবার নিজেদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন তাদের কারো সম্বন্ধেই মিথ্যা, বানোয়াট ও গলদ বর্ণনার অভিযোগ নেই। তবে, তাঁদের রিওয়ায়াতের মান ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের ন্যায় অতি উচ্চ ও সমুন্নত নয়।

এই রিওয়ায়াতগুলোকে দীনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে চালিয়ে দেয়া বা তার 'গ্রহণ–বর্জন'-কেও ইসলাম ও কুফরীর মানদণ্ড স্থির করার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য আমাদের নেই। কিন্তু অন্যদিকে এই রিওয়ায়াতগুলোকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা এবং বিলকুল অস্বীকার করে বসা আর তাকেই নিজের বাস্তবানুগ গবেষণা ও বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার 'সনদ' মনে করা— এটাও তো এক কিসিমের সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। আর এর কোনোটাই আমরা পছন্দ করি না!

নাকের দাগ

পৃথিবীর জন্ম লাভের পর কেটে গেছে কতোকাল! হৃদয়কাড়া চাকচিক্য, চারু-প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে 'বে-হিসাব' সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে সৃষ্টিজগত! পৃথিবীতে রচিত হয়েছে কতো বড় বড় সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ! জন্ম নিয়েছেন কতো নামী-দামী, জ্ঞানী-গুণী! আপন ক্ষমতার খানিক ঝলক দেখিয়ে চলে গেছেন কতো রাজাধিরাজ!

পৃথিবী বিভক্ত হয়ে আছে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও সাম্রাজ্যে। এক জাতি আরেক জাতিকে চেনে না। জানে না। এক দেশ আরেক দেশ সম্পর্কে বে–খবর। অজ্ঞ। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুরূহ। আসা-যাওয়ার উপায়-উপকরণ সীমিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও সাহায্য-সহযোগিতা ধরতে গেলে অনুপস্থিত। প্রত্যেক দেশেই নিরক্ষর মানুষের স্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল। কিতাব ও বই-পত্রের আজ এই-যে বিপুল সমাহার ও প্রাচুর্য, কারো কল্পনায়ও তা ছিলো না। প্রতিটি দেশ যেনো লা-পরোয়া—স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা একেকটি পৃথিবী।

ছিন্ন হয়ে গেছে এক দেশের সাথে আরেক দেশের ন্যূনতম সম্পর্কটুকুও। এজন্যেই স্বাভাবিক বিচারে প্রত্যেক দেশের জন্যে প্রয়োজন ছিলো পৃথক পৃথক পথ প্রদর্শক এবং প্রত্যেক কওমের জন্যে স্বতন্ত্র 'দাঈ' (ধর্ম প্রচারক)।

কিন্তু কুদরতের নির্ভুল হিসাবে হঠাৎ এসে যায় সে-সময়, যখন সারা পৃথিবী সংকুচিত হবে একটি মাত্র মানচিত্রে। মুছে যাবে সমস্ত খণ্ড খণ্ড দেশের সীমানা। রক্তারক্তি নয়, গালাগালি নয়, এক কওম আরেক কওমের সাথে গলাগলি করবে। অদৃশ্য হয়ে যাবে অপরিচিতির কালো পর্দা। ভেসে উঠবে জানাজানি ও সম্প্রীতির সবুজাভ পর্দা! সম্পর্কহীনতার জায়গা দখল করবে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব কিংবা দুশমনি। আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে ছোট হয়ে আসবে পৃথিবী। যান্ত্রিক সহযোগিতায় মুহূর্তের ভিতর পৌঁছে যাবে এক দিগন্তের খবর আরেক দিগন্তে। ছাপাখানা থেকে জন্ম নেবে বইমেলার এক সমৃদ্ধ জগৎ। লেখকের সংখ্যা বুঝি তখন হার মানাবে পাঠকের সংখ্যাকেও!

কুদরতি হিসাব রক্ষকের নিখুঁত মাপকাঠি

কুদরতের হিসাব রক্ষকের নির্ভুল হিসাবে দুনিয়া যখন চলতে চলতে এক বিশেষ মঞ্জিলে উপনীত হলো এবং পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতার শেষ ধাপে পা রাখলো, তখন পৃথিবীর বুকে নিরক্ষরতা ও মূর্খতার প্রধান পতাকাবাহী একটি দেশ, যে দেশে চর্চা হয় নি কোনোদিন ইলম ও হিকমতের, যে দেশে পৌঁছে নি সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষীণতম আলোকরশ্মিও, সেই পরিবেশে, যে পরিবেশ জন্ম দেয় নি কোনো এরিস্টোটল, কোনো জালিনূস, কোনো হোমার, কোনো কালিদাস, হ্যাঁ, সেই দেশের .. সেই পরিবেশের এক উম্মী পরিবারে, এক নিরক্ষর সমাজে আল্লাহ পাঠালেন এক এতিমকে। তাকে নির্দেশ দিলেন শুধু স্বদেশ ও স্বাজাতিকেই নয়, সারা পৃথিবীকেই ডাকো আল্লাহ্‌র দিকে। শান্তির দিকে। মানবতার দিকে। পথহারা মানব কাফেলাকে দাও সঠিক পথের সন্ধান।

তারায় তারায় ভরে গেছে রাতের আকাশ। নিঝুম রাতের কোল থেকে ঘুম ভেঙে এক্ষুণি জেগে উঠবে ইনসানিয়াত! এখন এ-নিখিল বিশ্বের উদয়স্থলে উদিত হও তুমি মানবতার সূর্য হয়ে। অজ্ঞ ও জ্ঞানী, মুর্খ ও বিদ্বান, সাদা ও কালো, পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষিত-অশিক্ষিত— সবার আঁধারঘেরা ভুবনে আলো জ্বালো। তোমার নূর ও জ্যোতির্ময়তার আলো। মূসার আসা (লাঠি), ঈসার ফু, সুলায়মানের সিংহাসন, ইবরাহীমের অগ্নিকুণ্ডের ফুলবাগান এবং ইউসুফের রূপ-সুষমা ইত্যাদি গোষ্ঠী-কেন্দ্রীক সীমিত পরিসরের মু'জিযার সময় এখন পেরিয়ে গেছে!

সময় এখন মোড় নেবে নতুন দিকে!

এখন তোমাতে জন্ম নেবে— এমন সব মু'জিযা, যা রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসের চেয়ে প্রখর ও আলোকোজ্জ্বল হবে। তুমি উম্মী। আর দুনিয়া জান দেবে শুধু পুঁথিবিদ্যার উপর। তুমি নিরক্ষর। আর পৃথিবীতে মূল্য এখন শুধু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও একাডেমিক বিদ্যার। তুমি লিখতে পারো না, অথচ দুনিয়া এখন পূজা করে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার। পরীক্ষা ও গ্রন্থাগারের। কিন্তু আমার কুদরতের মু'জিযা, আমার কর্ম-প্রক্রিয়ার নমুনা একটু চোখ খুলে দেখে নাও। দেখে নাও চোখ মেলে— দোয়াত-কলম-কালি-কাগজ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি।

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ.

'নূন-শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে'। -কলম: ১
এ-গ্রন্থাগার, এ-ছাপাখানা, এ-সব বই-পুস্তক, এ-প্রবন্ধমালা, এ-অনুসন্ধান ও গবেষণা, এ-কলম ও দোয়াতের সৃষ্ট সবকিছু তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। মুক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করবে তোমার সত্যবাদিতার কালেমা। তোমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের নথিপত্রে লাগাবে সত্যায়নের সিলমোহর। বদনসীব আবু জেহেল ও আবু লাহাব আজ তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তোমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে। আসলে দৃষ্টিহীনতার নিগড়ে ওরা বন্দি। কিন্তু সে দিন অতি সন্নিকট, যে দিন তাদের পরবর্তী বংশধররা —যাদেরকে মনে করা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ইমাম, হিকমত ও প্রজ্ঞার পথিকৃত, তারা— সাক্ষ্য দেবে তোমার পক্ষে। কেউ সরবে। কেউ নীরবে। ঘোষণা করবে বুলন্দ আওয়াজে যে, তোমার পালনকর্তার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি পাগল ও উন্মাদ নও। বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ ওরাই, যারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে।

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ.

'তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নও।' -কলম: ২
আঁধারঘেরা ওদের জ্ঞানের দুনিয়া। সে-আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে ওরা সংশয় প্রকাশ করছে তোমার নবুওয়ত প্রাপ্তির ব্যাপারে। যতো অগ্রগতিই সাধিত হোক এ-ধরাপৃষ্ঠে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও হিকমত-প্রযুক্তি লাভ করুক যতো উৎকর্ষই, তোমার আনীত দীনের অবস্থান দিনে দিনে হবে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির স্বীকৃতি হবে বুলন্দ থেকে বুলন্দতর। রাযী, গাযালী, তূসী, ফারাবী, ইবনে রুশদ ও ইবনে সীনা তোমার অনুসরণ-প্রিয়তা ও দাসত্বের ভিতরেই খুঁজে পাবে নিজেদের গর্ব ও অহংকার। গযনভী, ঘোরী, তুর্ক, সালজুক, মোস্তফা কামাল ও আমানুল্লাহ গর্বিত হবে তোমার গোলামীর শেকল পরে।

সময় বদলে যাবে। বদলে যাবে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিও। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে সূচিত হবে আমূল পরিবর্তন। আধ্যাত্মিকতার জায়গায় চালু হবে জাগতিকতার মুদ্রা। হবে, এর সবই হবে। কিন্তু তোমার উন্নত চরিত্র, তোমার চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের পারিতোষিক হবে অশেষ, অপরিমেয়।

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.

'নিশ্চয় তোমার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।' -কলম: ৩

তোমার তাবলিগ ও দাওয়াতের বিনিময় ও প্রতিদান শেষ হবে না। শেষ হবার নয় কোনোদিন। সংস্কার ও সংশোধনের যে ইনকিলাব তুমি সৃষ্টি করলে এ-পৃথিবীতে, দিন-দিন তার সীমানা হতে থাকবে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর। তোমার অনুগামী ও গোলামদের ইলম ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে পাশ্চাত্যজগত গড়ে তুলবে দর্শন ও বিজ্ঞানের বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার। তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গর্বানুভব করবে টমাস কারলাইল ও ড. গুস্টাভ উইল। তোমার হাল্কা আলোকরশ্মির ছোঁয়া পড়ায় লিও-টলষ্টয় ও মহাত্মা গান্ধী সকল ক্ষুদ্রতা পেরিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের রূপ পরিগ্রহ করবে। তোমার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হবে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ন্যায় ইউনিভার্সিটিগুলোতেও। তোমার কণ্ঠনিঃসৃত একেকটি কথা ও বাণী সংরক্ষণের জন্যে হল্যান্ড ও জার্মানিতে বড় বড় দারুল ইশা'আত (প্রকাশনা কেন্দ্র) স্থাপিত হবে। তোমার নাম ধ্বনিত হবে প্রতিদিন পাঁচবার বার্লিন, প্যারিস ও লন্ডনের সুউচ্চ মিনারচূড়া থেকে। তোমার শাগরিদদের কথা ও বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গৌরবের পুঁজি মনে করা হবে। যারা হবে তোমার ধর্মের অস্বীকারকারী, যারা তোমার নামের সাথে করবে দুশমনি, খোদ তাদেরই দোয়াত, কালি, কলম, লেখা, বুদ্ধি ও মস্তিস্ক তোমার মাহাত্ম্যের 'গান গাইবে'। তারা ওয়াক্‌ফ করে দেবে তাদের জীবনের সকল কীর্তি ও অবদান তোমার জ্ঞানের নিঃসীম পরিধির এবং তোমার বিরাট সফলতা ও কামিয়াবির সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে।

গুণ ও মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণতা

আজ তুমি উম্মী, এতিম, অসহায়। বাহ্যদৃষ্টির কাছে তুমি শক্তিহীন, প্রভাবহীন। তোমার চিরকালিন ও শাশ্বত মু'জিযা হলো এই যে, পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানই সাক্ষ্য দিয়ে যাবে তোমার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির। জ্ঞান-তাপস একদল বিদ্বান ও আলিম হবে তোমার কামিয়াবী ও সফলতার জীবন্ত সাক্ষি। কিন্তু তাই বলে ইলম ও জ্ঞানের ভাণ্ডার এ পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যাবে না। তার সরবতায় আসবে না কোনো ছন্দপতন। তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তোমার যাদুময়ী প্রভাব ও বিস্ময়কর কামিয়াবীর পাশাপাশি যখন তোমার উন্নত চরিত্র-মাহাত্ম্য ও মহান জীবনের আলোচনা আসবে তখন সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষাহীন সম্পদ আবারো কথা বলে উঠবে!

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত'। -কলম: ৪

ইতিহাস তোমার সৌন্দর্যের দীপ্তিমান সূর্যের প্রোজ্জ্বল আলোকচ্ছটার সামনে পেশ করতে অক্ষম হবে—

অন্য কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য,
অন্য কোনো জ্ঞানবীর ও দার্শনিক,
অন্য কোনো দিগ্বিজয়ী বীর ও সেনাপতি,
অন্য কোনো যোগী ও সাধক,
অন্য কোনো যুগ-মনীষী ও সংস্কারক,
এমন কি অন্য কোনো নবীর আলোকেও!

ইতিহাস উল্টে পাল্টে দেখবে, তার বুকে ধারণ-করা পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তি ও মনীষীদের জীবনালেখ্য। কিন্তু জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই, কোনো অবস্থানেই—

চরিত্রের সে-ই উন্নত চমক ও ঝলক,
হৃদয়ের সেই প্রশস্ততা ও উদারতা
এবং গুণ ও মাহাত্ম্যের সেই পরিব্যাপ্তি ও পরিপূর্ণতার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত ও নমুনা সেখানে খুঁজে পাবে না।

উনিশ ও বিশ শতকের মনস্তত্ত্ববিদগণ অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে এই ফলাফল বের করেছেন যে, মানবাত্মা তিনটি জিনিসের সমষ্টি—

১. বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা
২. আবেগ-অনুভূতি
৩. কর্মস্পৃহা বা কর্মোদ্যম

সপ্তম শতাব্দির এক উম্মীর আনীত কিতাবের মু'জিযা হলো এই যে, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবহ তিনটি আয়াতেই আল্লাহ্ পৃথিবীর মুসলিহে আজম (মহা সংস্কারক)-এর গোটা জীবনের সার-নির্যাস বলে দিয়েছেন। বিস্ময়কর মু'জিযা, বাগ্মিতা ও ব্যাপকতার সাথে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বাস্তবতাকেও সাফ করে দিয়েছেন–

এক. পয়গাম্বরের 'আকল' বা বুদ্ধিতে কোনো রকমের গোলমাল নেই। তাঁর মস্তিস্কে নেই কোনো রকম শূন্যতা ও বিকার। আর এমন হবেই বা কেনো?

তাঁর উপর তো অবিরত বর্ষিত হচ্ছে সেই মহান সত্তার দয়া ও করুণা, যিনি সৃষ্টি করেছেন এই আকল-বুদ্ধি-মস্তিষ্ক। অর্থাৎ তাঁর আকল লাভ করেছে, সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা। তাঁর আকলের সঠিক মূল্যায়ন যে করবে, তার নিজেরও তো থাকতে হবে মূল্যায়নের আকল ও যোগ্যতা!

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ.

'তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নও।' -কলম: ২

দুই. তাঁর ইচ্ছা ও হিম্মতে নেই কোনো দুর্বলতা। তিনি ঘাবড়ে যান না প্রচণ্ড বিরোধিতার ঘূর্ণিবাতের মুখেও। তিনি মশগুল নিজের দায়িত্ব পালনে। তাঁর এই দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবের যে বাস্তব ফলাফল সামনে আসবে, তা তাড়াতাড়ি তো নয়ই, দেরীতেও শেষ হবার নয়। তা অশেষ, অপরিমেয়, নিরবচ্ছিন্ন।

তিন. তাঁর আবেগ-অনুভূতি পূতঃপবিত্র ও স্বর্গীয় মহিমায় ভাস্বর। নিজের আবেগ-অনুভূতির উচ্চতা ও মাহাত্ম্যের কারণে এ-বিশ্ব জগতের কেউ যদি শ্রেষ্ঠ ও মহান হয়ে থাকেন, তবে সে তিনিই!

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত'। -কলম: ৪

এ-পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতো সংস্কারক ও মহান ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে মানবাত্মার এ-তিনটি বিষয়ের শুধু একটি শাখাতেই নিজের সংস্কারকর্মের পরিধিকে সীমিত ও আবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

কেউ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে খুবই শক্তিশালী ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির অবতারণা করে গেছেন। 'মারেফতে ইলাহী'-র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটন করে গেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের উপর লিখে গেছেন দারুণ দারুণ সব গবেষণা গ্রন্থ।

কেউ কেউ এসেছেন এমন, যারা ভাষার মাধুর্য দিয়ে, নির্মল চরিত্র দিয়ে এবং প্রভাবশালী ও কার্যকর পয়গাম শুনিয়ে কেড়ে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়-মন। বিশ্বজগতের মাহফিলের আবেগ-অনুভূতিকে করেছেন ব্যাকুল, বে-কারার।

কেউ কেউ এমনও ছিলেন, যারা হৃদয় ও মস্তিস্কের জায়গায় হিম্মত ও সাহসের লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন শরীরকে। ইস্পাতকঠিন ও আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে বাতিলকে পরাস্ত করেছেন একের পর এক যুদ্ধক্ষেত্রে। যারা সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা ও কুরবানীর তলোয়ার দিয়ে পৃথিবীর রনাঙ্গণের প্রতিটি অংশে এঁকে দিয়েছেন বিজয়-চিহ্ন। (অর্থাৎ তাদের কারো জীবনেই পরিপূর্ণতা ছিলো না।)

কিন্তু সেই বে-নজির ব্যক্তিত্ব, যিনি একদিকে ছিলেন বদর যুদ্ধের সিপাহসালার, অপর দিকে তীব্র ক্ষুধার মুখে পাথরও বেঁধেছেন পেটে!

একদিকে ছিলেন একজন সফল ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, অন্য দিকে সমস্ত রাত কেটে যেতো তাঁর বিশ্বপ্রভুর স্তুতি-বন্দনায়!

একদিকে তিনি কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্ক্ষী। অপরদিকে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল!

একদিকে তিনি পৃথিবীর আইন প্রণেতাগণের শিক্ষক ও দিক-নির্দেশক, আরেক দিকে ইলম ও হিকমতের শিক্ষাগুরু!

একদিকে তিনি শিক্ষা দিতেন ইশক-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার রহস্য, আরেকদিকে পরিচালনা করতেন জ্ঞান ও বুদ্ধির 'দরসগাহ' (পাঠকক্ষও)!

একদিকে আবেগ-অনুভূতির গোলাপবনের সবচে' সুন্দর, মনোহারী ও হৃদয়কাড়া ফুল তিনি, আরেক দিকে কর্মোদ্যম ও প্রবল ইচ্ছার ময়দানের শাহ-সওয়ারও তিনিই!

এমন পরিপূর্ণ ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব তো শুধু 'মুসলিহে আজম' (মহা সংস্কারক) এরই রয়েছে, যাঁর সত্যায়ন সীমাবদ্ধ নয় কোনো সাময়িক মু'জিযার উপর। বরং যাঁর সত্যবাদিতার উপর দোয়াত, কলম এবং লিপিবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের নীরব ভাষারা— সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল।

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ.

'নূন-শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে'।[১] -কলম:১

---

১. ن এর অর্থ তাফসীরকারগণ লিখেছেন নিজ নিজ গবেষণা মতো। কিন্তু এর আভিধানিক অর্থ 'দোয়াত'। এটাই বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদা থেকে।

عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله خلق النون و هي الدواة و عن الحسن في قوله "ن" و هو الدواة.

এ-কালের মনস্তাত্ত্বিকরা নিজেদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারেন যে, শ্রেণী বিন্যাসে 'আবেগ-অনুভূতি'র কথা 'ইচ্ছা'র আলোচনার আগে আসা উচিত ছিলো।
কিন্তু বেচারাদের এ-খবর নেই যে, সীরাতের বুলন্দি ও উচ্চতার আসল পরীক্ষার সময় তো —সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে— সফলতা অর্জনের পরেই হতে পারে। তাই কর্মক্ষেত্রের সর্বশেষ কামিয়াবি ও সফলতার আলোচনা সীরাতের মাহাত্ম্যের আগে হওয়া জরুরী ছিলো। মনোবিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ্যবইগুলোর শ্রেণী-বিন্যাসে —এই বাহ্যত-সূক্ষ্ম সংস্কারের মাধ্যমে— সুস্পষ্ট কিতাব আল-কুরআন পুরো অর্থটিকে পরিষ্কার করে দিয়েছে।
পয়গাম্বর! এ-মুহূর্তে তুমি দুর্বল, পরাজিত, নিঃস্ব-অসহায়। নাদান হতভাগারা এখন তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। কিন্তু সত্ত্বরই কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ দাওয়াত প্রচারে তোমার সফলতা অর্জনের সে-ই সময় অতি সন্নিকট, যখন বড় বড় ভাণ্ডারের চাবি থাকবে তোমার হাতে। তুমি হবে বিশাল ফওজের সিপাহসালার। মালিক হবে তুমি বড় বড় শক্তিধর সালতানাত ও সাম্রাজ্যের। তখন পরিদৃষ্ট হবে তোমার মহান চরিত্রের 'ঝলক'। তখন চোখে পড়বে, আজকের এ-বিনয় নম্রতা, আজকের এ-সহনশীলতা ও দয়ার্দ্রতা— তুমি পরাজিত ও অক্ষম ছিলে বলে নয়, বরং এ ছিলো তোমার ফেরেশতাসুলভ কোমল স্বভাব-প্রকৃতির কষ্টার্জিত ফসল। সুতরাং তোমার সীরাতের মাহাত্ম্য ও উচ্চতার চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে এই কার্যক্ষেত্রের কামিয়াবি ও সফলতার সোপানে পৌঁছার পরই।

সু-সংবাদের দিনক্ষণ

এ-সুসংবাদ বার্তা নাযিল হয় ঠিক ঐ মুহূর্তে যখন চারদিক থেকে বাতিল ঘিরে রেখেছিলো হককে। যখন মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক অসহায় এতিম হাতে-গোনা কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে মক্কা ও আশ্-পাশের সমস্ত আবাদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুভব করছিলেন চরম অসহায়ত্ব!
যখন তাঁকে সহযোগিতা করার ও তাঁর পক্ষ সমর্থন করার কোনো আলামতই বাহ্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ছিলো না। তাই সাথে সাথে এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর কথাও ইরশাদ হয়ে যায় যে, এইসব ভবিষ্যতবাণীকে গ্রহণ করার জন্যে কে প্রস্তুত আছে? আজ তো খোদ

তোমার মনই সফলতা অর্জনের সমস্ত বাহ্যিক উপকরণ ও সূত্র থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু কান পেতে শোনো—

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.

'সত্ত্বরই তুমি দেখে নেবে এবং তারাও দেখে নেবে— কে তোমাদের মধ্যে বিকার গ্রস্ত'। -কলম: ৫-৬

আজ এরা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার উপর বড়াই করছে। তোমাকে নির্বোধ ও মূর্খ ভাবছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওরাই নাদান, নির্বোধ ও দিশেহারা! ওরাই বিভ্রান্ত!

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

'তোমার প্রতিপালক সম্যকভাবে জানেন— কে স্বীয় পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে; তিনি জানেন তাদের কথাও যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত'। -কলম: ৭

কিন্তু কিছু দিন পর এ-নির্বোধদের চোখেই ধরা পড়বে যে, কে বিভ্রান্ত আর কে সঠিক পথপ্রাপ্ত। কার মাথা নষ্ট ও অলিক ধারণায় ঠাসা, আর কার হাতে রয়েছে সত্য ও বাস্তবতার বাগডোর। এই বিশ্ব জাহানের পালনকর্তাই তার মিমাংসা করবেন। কেয়ামতের দিনে নয়— এই মাটির পৃথিবীতেই!

এ-ফায়সালা সত্ত্বরই কার্যকর হতে যাচ্ছে। সুতরাং তুমি যেনো আবার তা সুদূরপরাহত ভেবে প্রচণ্ড বিরোধিতার এ-ভিড়ে, সেই না-লায়েক মিথ্যাবাদীদের বেড়াজালে আটকে না পড়ো।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.

'অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না। তারা চায়, যদি তুমি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে'। -কলম: ৮-৯

বাতিল পূজারীদের মিষ্টি কথায় এবং তাদের শান্তি-প্রিয়তার মিথ্যা স্লোগানে আপন দায়িত্ব থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না ! এরা তো মনে প্রাণে এটাই চায় যে, তুমি এদিকে দাওয়াত ও রিসালাতের মহা দায়িত্বে একটু ঢিল দাও, আর ওদিকে ওরা কমিয়ে দেবে অত্যাচারের মাত্রা। পরিণাম কি হবে না হবে— তা না-ভেবে দাওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে মশগুল

হয়ে যাও। ওরা বলুক তোমায়— জেদি, হঠকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, অপরিণামদর্শী, আরো যা যা পারে বলে যাক! যা-ইচ্ছে তাই বলুক। ওদের মিথ্যা প্রচারে মোটেই প্রভাবিত হবে না। বাতিলের সঙ্গে কোনো প্রকার সমঝোতায় আসবে না। আলোর মুকাবিলায় অন্ধকার থাকবেই। হিদায়াত ও সত্যবাদিতার মুকাবিলায় প্রতিপক্ষ থাকবেই— ভ্রান্তি, মিথ্যা ও কলুষতা। এটাই প্রকৃতির চিরাচরিত বিধান।

পবিত্রতা ও নির্মলতার স্বচ্ছ ঝরনার মুকাবিলায়,

নেকি ও ইখলাসের সমুদ্রের মুকাবিলায়,

সৌন্দর্য, পূর্ণতা ও প্রেম-ভালোবাসার প্রদীপ্ত সূর্যের মুকাবিলায়—

অপরিহার্যভাবেই সমান তালে থাকবে— নষ্টামি, মুনাফেকি, অপবিত্রতা, অমানবতা এবং বিকৃতি ও নোংরামির স্তূপ!

তাই সাথে সাথে এ কথাও ইরশাদ হয়ে যায়— কার সাথে তুমি সন্ধি স্থাপন করতে চাচ্ছো? কার দিকে প্রসারিত করবে ঐক্যের প্রশস্ত হাত? তাদের সাথে, যাদের এই বৈশিষ্ট্য? যারা মিথ্যাবাদী? প্রতারক? প্রবঞ্চক? শঠ? পাপিষ্ঠ? নিষ্ঠুর?

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ.

'যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, তার আনুগত্য করবে না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, যে ভালো কাজে বাধা দেয়। যে সীমালঙ্ঘন করে। যে পাপিষ্ঠ। নিষ্ঠুর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী'।

-কলম: ১০-১৪

রাসূলের আদর্শ

রাসূল আজ বাহ্যদৃষ্টির অন্তরালে। কিন্তু রাসূলের মহান আদর্শ দেদীপ্যমান! সেই কদম মুবারক, যাঁর উপর কপাল রাখা আমাদের জন্যে মহাসৌভাগ্যের, তা আজ আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর 'পদচিহ্ন'-তো আজো বিদ্যমান! মহান চরিত্রের অধিকারী আজ

'রফিকে 'আলা' (সর্বোত্তম বন্ধু)-র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। কিন্তু মহান চরিত্রের আমানত তো আজো সংরক্ষিত আছে মুমিনের দিলে! ইতিহাসের পাতায়!!

পয়গাম্বরের পয়গাম আজো আছে।

তাঁর কাজ আজো আছে।

আছে তাঁর নামও।

আজ প্রতিটি মানবদেহ নিজের সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী সেই নূরের ঐশ্বর্য থেকে লাভ করতে পারে সমৃদ্ধি ও প্রশান্তি।

তবে আজও যেমন 'মহান চরিত্রের অধিকারী'-র মহান সম্পর্ক বাকি আছে, তেমনি বাকি আছে 'কারণে-অকারণে শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির অধঃপতনের সিলসিলাও'।

সেই হতভাগাদের সবচে' বড়ো পরিচয় হলো এই যে, যখন তাদের আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়, যখন তাদেরকে প্রতারণা ও অনাচারের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়, যখন তাদের আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান শুনিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ.

'তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে, (এ-সব তো) সেকেলে উপকথা'। -কলম: ১৫

অধঃপতন আর গোমরাহির সর্বশেষ স্তরটা বুঝি এই যে, তখন হিতোপদেশও তিক্ত মনে হয়! সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে সামান্যতম সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করে ফেলে নিজের বুদ্ধি ও মেধা, নিজের আধিপত্য ও সম্পত্তির উপরই শুধু সে হয়ে উঠে নির্ভরশীল। তখনই নেমে আসে আল্লাহ্‌র শাস্তি এই আকৃতি ধারণ করে যে, সেই হতভাগার নাম দাগিয়ে দেয়া হয়![১]

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ.

'আমি তার নাক দাগিয়ে দেবো'। -কলম: ১৬

---

১. (হ্যাঁ .. এই শেষ-শাস্তি 'নাক দাগানো' থেকেই আমরা আমাদের লেখার শিরোনাম রেখেছি— নাকের দাগ!)

'রফিকে 'আলা' (সর্বোত্তম বন্ধু)-র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। কিন্তু মহান চরিত্রের আমানত তো আজো সংরক্ষিত আছে মুমিনের দিলে! ইতিহাসের পাতায়!!

পয়গাম্বরের পয়গাম আজো আছে।

তাঁর কাজ আজো আছে।

আছে তাঁর নামও।

আজ প্রতিটি মানবদেহ নিজের সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী সেই নূরের ঐশ্বর্য থেকে লাভ করতে পারে সমৃদ্ধি ও প্রশান্তি।

তবে আজও যেমন 'মহান চরিত্রের অধিকারী'-র মহান সম্পর্ক বাকি আছে, তেমনি বাকি আছে 'কারণে-অকারণে শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির অধঃপতনের সিলসিলাও'।

সেই হতভাগাদের সবচে' বড়ো পরিচয় হলো এই যে, যখন তাদের আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়, যখন তাদেরকে প্রতারণা ও অনাচারের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়, যখন তাদের আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান শুনিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ.

'তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে, (এ-সব তো) সেকেলে উপকথা'। -কলম: ১৫

অধঃপতন আর গোমরাহির সর্বশেষ স্তরটা বুঝি এই যে, তখন হিতোপদেশও তিক্ত মনে হয়! সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে সামান্যতম সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করে ফেলে নিজের বুদ্ধি ও মেধা, নিজের আধিপত্য ও সম্পত্তির উপরই শুধু সে হয়ে উঠে নির্ভরশীল। তখনই নেমে আসে আল্লাহ্র শাস্তি এই আকৃতি ধারণ করে যে, সেই হতভাগার নাম দাগিয়ে দেয়া হয়![১]

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ.

'আমি তার নাক দাগিয়ে দেবো'। -কলম: ১৬

---

১. (হ্যাঁ .. এই শেষ-শাস্তি 'নাক দাগানো' থেকেই আমরা আমাদের লেখার শিরোনাম রেখেছি— নাকের দাগ!)

দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই ফায়সালা করে দেয়া হয় তার অপমান ও লাঞ্ছনার। আখেরাতে কিভাবে তার নাক দাগিয়ে দেয়া হবে, তা তো জানা যাবে সেখানেই। তবে দুনিয়াতে নাক দাগিয়ে দেয়ার অর্থ খুবই স্পষ্ট।

'যা মানুষকে সর্বক্ষণ অপমানিত করে,
লাঞ্ছিত করে পদে-পদে,
যা কারো লজ্জাকর অপরাধকে ফাঁস করে দেয় সর্বসমক্ষে,
যারপর সে অপরাধী আর মুখ দেখানোরও যোগ্য থাকে না—
তা-ই তার নাক দাগিয়ে দেয়া।

আল্লাহ সবাইকে নাকের দাগের অসম্মানজনক লাঞ্ছনা থেকে হিফাজত করুন!

সর্বোত্তম আদর্শ

আমানতে ইলাহী

বিশ্ব জাহান সুশোভিত হয়েছে হৃদয় কাড়া অপরূপ শোভা সৌন্দর্যে। রহস্যময়ী প্রকৃতি বিস্তার করে আছে প্রতারণার মোহময় ইন্দ্রজাল। বিশ্ব সৃষ্টির একটি ছবি হেসে উঠলো সোনালী রূপালী দীপ্তিতে।

ঠিক তখনি অতীত-ভবিষ্যতের ভিতরে পৃথিবীর সবচে' মূল্যবান, সৃষ্টির প্রিয়তম রত্ন ও মুক্তা 'আমানতে ইলাহী'রূপে পৃথিবীর ভিড়ের বাজারে এগিয়ে এলো আর মহাশূন্যের নির্জনতা থেকে ভেসে এলো এই আওয়াজ—

'আছে কেউ? পারবে আমানতে ইলাহীর এ-মহা সম্মান বহন করতে? আছে কি কেউ? পারবে এ-গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে?

ঊর্ধ্বজগতে ছেয়ে গেলো সুনসান নীরবতা।

পৃথিবীতে সৃষ্টি হলো কম্পন।

থরথর কাঁপতে লাগলো পর্বতমালা।

থেমে গেলো সমুদ্রের ফেনিলোত্তাল তরঙ্গমালা।

ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে গেলো চাঁদের জোছনা।

সূর্যালোক হয়ে গেলো ফ্যাকাসে।

নিঃসীম ঐ উঁচু আসমান নিজেকে সেই 'আমানত' বহনের অযোগ্য মনে করে চোখ আনত করে ফেললো।

বিশাল বিস্তৃত জমিন নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্যের অনুভূতিতে একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়লো।

তখন, তখন এগিয়ে এলো দুর্বল, অক্ষম, তুচ্ছ, অসহায়, নিজের উপর অতিশয় জুলুমকারী 'মাটির পুতুল'— এ-মানুষ। আপন হিম্মতের বাহু প্রসারিত করে মাথায় তুলে নিলো সেই 'আমানতে ইলাহী'র গুরু দায়িত্বভার!!

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً.

'আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এ-আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো (অপারগতা প্রকাশ করলো) এবং এতে ভীত হয়ে গেলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে জালেম অজ্ঞ'। -আহযাব: ৭২

রোজ হাশরে

মাটির তৈরি আদমের বে-শুমার বংশধর পৃথিবীতে এসে আবাদ হয়েছে আবার চলে গেছে। আগতদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক সময় পৃথিবীর কোণায় কোণায় গড়ে উঠেছে তাদের আবাদি ও বাসস্থান। তাদের সংখ্যাধিক্যে কানায় কানায় ভরে গেছে পৃথিবী। আদমের সেই ছোট্ট বাগিচা এখন ভরে গেছে ফুল-ফল-তরুলতায়। কিন্তু একদিন বাগান উজাড় হয়ে গেলো। কাল-পরিক্রমায় একদিন মাটির পৃথিবীর দীর্ঘ রজনীর অবসান ঘটলো। তারপর? তারপর উদিত হলো হাশরের ঊষা। তলব করা হলো দুর্বল মানুষকে। তাড়াহুড়ো, ভুলভ্রান্তি আর অপরাধ-প্রবণতা মিশে আছে যার স্বভাব-প্রকৃতির ভাঁজে ভাঁজে।

মানব সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যই হাজির হয়েছে— তার উপর অর্পিত আমানতের দায়িত্ব পালনের হিসাব বুঝিয়ে দিতে। সংখ্যায় তারা অগণিত। অংকের সংখ্যা তাদের সবাইকে গণনার ভিতরে আনতে অক্ষম। এখানে, এ-বিশাল জনস্রোতে আছে হরেক রকম মানুষ। কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ ফাসিক (সীমা লংঘনকারী), কেউ ফাজিল (দুস্কৃতকারী), কেউ মু'মিন, কেউ কাফির, কেউ আলেম, কেউ জাহেল, কেউ আমির, কেউ ফকির, কেউ হাকিম, কেউ কবি, কেউ আবিদ (ইবাদত নিমগ্ন), কেউ যাহিদ (দুনিয়াবিরাগী), কেউ ওলী, কেউ দরবেশ।

সবাই দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে।

কিন্তু কারো আমলনামাই কুদরতের হিসাবে টিকলো না। সকলের আমানতের দামানেই খেয়ানতের দাগ লেগে আছে। সামনে পেশ করার মতো নেই কারো কোনো আমল। সর্বত্র-নজরে আসছে হা-হুতাশ, আক্ষেপ, লজ্জা, অনুতাপ আর সর্বগ্রাসী অস্থিরতা। আহাজারি আর আর্তচীৎকার। এমন কি পুণ্যাত্মা নবীগণের মুখেও 'ইয়া নফসী .. ইয়া নফসী' রব উঠেছে, যাঁদেরকে পাঠানোই হয়েছিলো মানবতার হিদায়াত ও মুক্তির জন্যে। যাঁরা আরশের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীর বুকে।

উদ্ধত ও শক্তিদর্পী মানুষ সে মুহূর্তেও নিজের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা থেকে ফিরে আসে না। সেখানেও সে এই প্রশ্ন করে বসে— 'এমন অসম্পূর্ণ জীবকে সৃষ্টি করে তাহলে লাভটা হলো কী, যাদের কেউ-ই মহাবিচারের মানদণ্ডে পুরোপুরি উতরে যেতে পারে নি?

এ-অগণিত মানুষকে সৃষ্টির রাজকীয়-পোশাক পরিয়ে সম্মানিত করার ফায়দাটাই বা কী ছিলো, যাদের একজনও সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরা করতে পারে নি'?

তখন পবিত্র আদালতের মহান এজলাসের সংরক্ষিত এলাকা থেকে ভেসে আসে এ-জওয়াব—

'ওরে মূর্খ মানুষ! স্বীকার করো তোমার মূর্খতা!!

ওরে অজ্ঞ, ওরে মূঢ় আদম সন্তান!

নিজের অজ্ঞতার জন্যে তুমি কি একটুও লজ্জাবোধ করো না?

তোমার সামনে ঐ-যে দেখা যাচ্ছে নূরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যিনি নিজের ব্যাপারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যের নাজাতের চিন্তায় মশগুল! তোমারই মতো রক্ত-মাংস-গড়া একজন মানুষ তিনি! কিন্তু তিনি ছিলেন আমার 'আবদে কামিল'—পরিপূর্ণ গোলাম! আমার আমানতের এক বিশ্বস্ত মুহাফিজ! কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন তিনি যথাযথভাবে। মাটির পৃথিবীতে প্রবেশ করার আগে তিনি ছিলেন আমার সার্বক্ষণিক স্তুতি-বন্দনায় নিমগ্ন। আমি তখন তাঁকে ডাকলাম 'আহমাদ' (অধিক প্রশংসাকারী) নামে! মাটির ধরায় যখন তিনি আমার একান্ত অনুগত বান্দা হয়ে আগমন করলেন, আমি তাঁর প্রতিদান দিলাম 'মুহাম্মদ' (সর্বোচ্চ প্রশংসিত) 'লকব' (উপাধি) দিয়ে!

ওরে উদাসীন মানুষ! আমার প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম এ-বান্দার জন্যেই কেবল আমি জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম স্থির করে রাখি নি, যারা প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালোবেসেছে, পদে-পদে অনুসরণ করেছে তাঁর 'পদচিহ্ন', তাদের জন্যেও আজ কী কী প্রতিদান ও বিনিময় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, তা জানো তুমি!

* * *

প্রিয় পাঠক! ঘেঁটে দেখুন ইতিহাস। পড়ে দেখুন দার্শনিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের জীবন কথা। একটু নজর বুলিয়ে দেখুন আল্লাহ্‌র ওলী ও

দরবেশদের কীর্তিময় জীবনের উপর। একটু পড়ে দেখুন আম্বিয়া আ.-এর তাবলিগ ও দাওয়াতের ইতিহাস। পৃথিবীর বড় বড় সংস্কার, বড় বড় বিপ্লবের কাহিনী নিয়েও একটু চিন্তা করুন। তলিয়ে দেখুন। গবেষণা করুন। দেখবেন, প্রতিটি ইসলাহ ও সংস্কারকর্ম, প্রতিটি তাবলিগ ও দাওয়াতের আমল সীমাবদ্ধ ছিলো কোনো বিশেষ দেশ, কোনো বিশেষ জাতি এবং কোনো বিশেষ কালের সাথে।

হযরত ঈসা মাসীহ আ. শুধু বনী ইসরাইলকে বাঁচাতেই এসেছিলেন। হযরত হূদ আ., হযরত শু'আইব আ., হযরত সালেহ আ.— তাঁরা সকলেই প্রেরিত হয়েছিলেন আপন আপন সম্প্রদায়ের নিকট। ব্যতিক্রম ছিলো শুধু রাসূলে আরাবীর (উৎসর্গিত হোক তাঁর জন্যে আমার জীবন) দাওয়াত ও পয়গাম। তাঁর আগমন পৃথিবীর কোনো বিশেষ ভূখণ্ডের জন্যে নয়। নয় কোনো বিশেষ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর জন্যেও। তাঁর দাওয়াত সার্বজনীন, সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বজাতির জন্যে। মানব সভ্যতার প্রতিটি স্তরের জন্যে তা উপযোগী। প্রযোজ্য তা সকল প্রকার মানবীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকের জন্যেই রয়েছে এতে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা।

পরিপূর্ণতা এবং খতমে নবুওয়ত

'সায়্যিদুল মুরসালীন'-এর আরেকটি লকব বা উপাধী হলো— 'খাতামুন্নাবিয়্যীন'। অর্থাৎ যাঁর দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে নবুওতের পুণ্য সিলসিলা। এ-খতমে নবুওতের অর্থ ও মর্ম একেবারে সুস্পষ্ট। যখন একটি পয়গাম এমন সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণরূপে এসে পড়লো যে, তাতে কোনো প্রকার সংশোধন, সংকোচন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কিংবা কোনো প্রকার রদ-বদলের বিন্দুমাত্র অবকাশই বাকি থাকলো না, তখন নতুন কোনো পয়গামের উদ্ভব একেবারেই অর্থহীন। পয়গামের সর্বব্যাপী হওয়ার অর্থই হলো— ভবিষ্যতে এর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেলো। আরবের উম্মী নবী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আমার আনীত পয়গাম মানব জীবনের সকল প্রকার প্রয়োজন, চাহিদা ও সম্ভাব্য সমাস্যার জন্য পরিপূর্ণ হিদায়াতনামা ও দিক-নির্দেশনা। এ ছিলো আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবিলায় আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসে নি। আসতে পারে নি। আসতে পারবেও না।

এই সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ পয়গামের বাহকের জন্যেও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হওয়া ছিলো জরুরী। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গাম কোনো পাহাড় অথবা বৃক্ষের উপর নাযিল হতে পারতো লিপিবদ্ধ আকারে, কিংবা কোনো সুবিন্যাস্ত কিতাবের আকৃতিতে। কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিলো পয়গাম ও পয়গাম্বর একটিকে অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দেয়া এবং একটির সত্যায়নের জন্যে অপরটিকে জামিন বানিয়ে দেয়া।

তবে ক্রমানুসারে পয়গাম্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই পয়গামের পূর্বে। পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক ও রাহনুমা স্বীয় জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন স্বজাতি ও স্বদেশের মাটিতে। সবাই তাঁকে জানতো, চিনতো ডাকতো 'আল-আমীন' বলে।

যখন তাঁর উপর নাযিল হতে লাগলো সত্যের পয়গাম, তখন থেকে নিয়ে পরবর্তী জীবনের তেইশটি বছর তিনি কাটিয়েছেন তাঁরই মতো মানুষের ভিতরে। তাঁর পাক-পবিত্র ও নির্মল জীবন তখনও শত্রুর জন্যে ছিলো এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। তাঁর উপর কিভাবে দোষ-ত্রুটি ও অপবাদ চাপিয়ে দেয়া যায়, তারই সুযোগ তালাশ করতো দুশমনরা। আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মতো দুশমনরা সামনেও অগ্রসর হয়েছিলো। কিন্তু এ-শিশির-শুভ্র চরিত্রে, এ-পাক-পবিত্র জীবনে সামান্যতম দোষ-ত্রুটিও খুঁজে বের করতে তারা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে ফেরেশতা বানিয়ে পাঠানো হয় নি। পাঠানো হয় নি 'অন্যলোকের' সৃষ্টি হিসাবেও। মানবিক গুণাবলী, চাহিদা ও প্রয়োজনের অধীন করেই তাঁকে পাঠানো হয়েছে এ-জগৎ সংসারে। তিনি বিয়ে করেছেন। একটি নয়, বহু। সন্তান-সন্ততিও ছিলো তাঁর একাধিক! যাঁদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর জীবদ্দশাতেই আর কেউ বেঁচে ছিলেন তাঁর ওফাতের পরও। তাঁর দোস্ত-আহবাব—বন্ধু-বান্ধব ছিলো। ছিলো দুশমনও। তাঁর পাশে আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাগণের এক মুবারক জামাত ছিলো। আবার মুনাফিকের দলও ছিলো। তাঁর জীবনে এসেছে দুঃখ-বেদনা, শোক-ব্যথা। আবার পাশাপাশি এসেছে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের এক অনিন্দ্য হিল্লোল। জিহাদও করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে অনেক। আবার নিরাপত্তা, সন্ধি ও শান্তিময় সময়ও কাটিয়েছেন তিনি। সে-সব যুদ্ধে কখনো হয়েছেন তিনি বিজয়ী, কখনো এসেছে পরাজয়। তবে বিজয়ের পাল্লাই ছিলো অধিক ভারী। তাঁর জীবনে যেমন এসেছে প্রত্যাখ্যানের মুহূর্ত, তেমনি এসেছে বরিত হওয়ার মধুলগ্ন।

মোটকথা; একটি জীবনে অভিজ্ঞতা লাভের এবং চড়াই-উতরাইয়ের যতো ধাপ ও স্তর সামনে আসতে পারে, তার সবই এসেছে তাঁর জীবনে। কিন্তু গ্লানিকর কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। এই যে তাঁর বৈচিত্রভরা জীবন-চিত্র— আজ শুধু এ বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীর জন্যে ত্রাতা-পাঠ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু আমরা যে ভাবি না !

আমরা যে চিন্তা করি না!

আমরা যে অনুসন্ধান করি না!

আমরা যে শত ত্রাহি-তেও সঠিক ত্রাতা খুঁজে বের করতে চাই না!!

সর্বব্যাপিতা

মাহবুবে খোদার মুবারক জীবনের সর্বব্যাপিতা এই জন্যে প্রয়োজন ছিলো, যাতে উম্মতের প্রত্যেক সদস্যই তাঁর এ-নমুনাকে সামনে রেখে সাধ্য ও সামর্থ্যানুযায়ী তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে পারে।

সময়ের কুঞ্জবনে বারবার এসেছে মন ও মননের প্রতিপালনকারী বসন্ত। কিন্তু প্রকৃতির এ বসন্ত আসে ক্ষণকালের জন্যে। এসেই আবার চলে যায়। নবুওত উদ্যানের যে বসন্ত, তা চির জাগ্রত, চির সবুজ। বিশেষ সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং তা সুরভিত করবে সর্বকালের সর্বযুগের সব মানুষের মন-মনন, চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি। আজ পৃথিবীর মানুষের সবচে' বড় দুর্ভাগ্য হলো এই যে, তারা সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এ-আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলেছে। খোদ মুসলমানরাও অনেকাংশে এতে শামিল। আমরা কি হিদায়াত-সূর্যের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি না? আর যদিওবা আমাদের ভিতরে আলোর অন্বেষা কিছু থেকে থাকে, কিন্তু আমরা সেই নিভু নিভু বাতি নিয়েই সন্তুষ্ট। আমাদের মধ্যে আজ অনেক দুর্ভাগা মুসলমান এমনও মিলবে যারা ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই তাবৎ সৌন্দর্য ও পূর্ণতার মাপকাঠি মনে করে। তাদের কাছে জাতীয় শিক্ষা শুধু এ-কারণে প্রয়োজন যেহেতু ইউরোপে তার প্রচলন রয়েছে। সামাজিকতাকে সার্বিকভাবে মানোন্নত করতে হবে শুধু এ জন্যে যে, এটাই ইউরোপের জীবনধারা। সুদ খাওয়া দোষনীয় নয়— যেহেতু এর মাধ্যমেই ইউরোপ উন্নতি সাধন করছে। হায়! এমন লজ্জাহীনভাবে দলিল হিসাবে ইউরোপকে সামনে টেনে আনতে ওদের বিবেকে একটু বাঁধেও না!

এদেরকে বাদ দিয়ে আসুন তাদের কথায় যাদেরকে মনে করা হয় ধর্মপরায়ণ। এদের দুর্গতি হলো এই যে, এরা সরদারে রিসালাতের দরবার থেকে 'ফয়েয' ও 'বরকত' হাসিল না-করে নিজের সকল চেষ্টা সাধনা ও অনুসন্ধান বন্দি করে রেখেছে কোনো আলেম, কিংবা কোনো পীর পর্যন্তই। অথচ উম্মত যতো মহানই হোক, কিছুতেই তারা আল্লাহ্র রাসূলের জুতার ধুলিকণার বরাবরও হতে পারবে না।[১]

যদি আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ 'আল আমীন'-এর পদাংকানুসরণ করে চলতাম, তাহলে আমাদের মাঝে থাকতো না খেয়ানত আর অবিচার।

যদি আমরা 'রাউফু'র রাহিম' (স্নেহশীল, দয়াময়)-এর অনুসারী হতাম, তাহলে আমাদের পরস্পরের ভিতরে জন্ম নিতো না অবিশ্বাস, কু-ধারণা ও রেষারেষি।

যদি আমরা হেরার রাজতোরণ থেকে বেরিয়ে-আসা দ্যুতিত আদর্শ ও পদচিহ্নকে জীবন পথের পাথেয় বানাতাম, তাহলে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারতো না কোনো ধরনের মলিনতা ও আবিলতা।

যদি আমরা এই বদর বিজয়ী সিপাহসালারের মাহাত্ম্য হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারতাম, তাহলে আমাদেরকে এভাবে বয়ে বেড়াতে হতো না পরাজয়ের গ্লানি, লাঞ্ছনা ও জিহাদকে ভালোবাসার কারণে সন্ত্রাসের অভিযোগ।

যদি আমরা 'রহমাতুল-লিল-আ'লামীন'-এর পয়গামের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পারতাম, তাহলে আমরাই হতাম পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বরিত।

যদি আমরা পবিত্র নাম 'আহমাদ'-এর সম্মান ও মর্যাদা হৃদয়ে লালন করতাম,

যদি আমরা আল্লাহ্র স্তুতি-বন্দনা থেকে এমনভাবে বিমুখ না হতাম,

যদি বাস্তবিকই মুহাম্মদ নামের সাথে আমাদের গভীর প্রেমময় সম্পর্ক থাকতো, তাহলে আমাদের বর্তমান অসহায়ত্ব ও দুর্গতির কালো রাত কবেই ভোরের আলোয় অদৃশ্য হয়ে যেতো!!

---

১. তবে পীর ও সায়খ যদি এমন হন যে, তিনিই মুরিদকে হাত ধরে ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবেন মৌমাছি বানিয়ে নবুওত উদ্যানের সেই ফুলেল পরিবেশে, তা হলে ভিন্ন কথা।

সৌভাগ্যময় জন্ম

ইতিহাসের বৃহৎ কলেবরের নির্ভরযোগ্য কিতাব সামনে নিয়ে ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষ এবং সপ্তম শতকের সূচনাকালে পৃথিবীর দৃশ্যপট কী ছিলো— একটু কল্পনা করুন। পৃথিবীতে তখন পরাশক্তি ছিলো দু'টি। যাদের নামে (ভয়ে) অন্য সবাই থরথর করে কাঁপতো। যাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য মেনে চলতো পূর্ব-পশ্চিমের সবাই। পশ্চিমে অবস্থিত ছিলো রোমান ইম্প্যায়ার (Roman Empire) শাহানশাহে রোমের সালতানাত। আর পূর্বে ছিলো শাহানশাহে ইরানের সালতানাত। প্রত্যেকের কাছেই ছিলো সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, অঢেল সম্পদ আর প্রাচুর্য। প্রত্যেকেই অবস্থান করছিলো সভ্যতা-সংস্কৃতির শীর্ষ চূড়ায়। কিন্তু উভয় সালতানাতেরই নৈতিক অবক্ষয় ছিলো অবর্ণনীয়। বিলাসিতা কেড়ে নিয়েছিলো তাদের পৌরুষ। শরীর-বিধ্বংসী রোগের চেয়ে আত্মা-বিধ্বংসী রোগেই তারা ছিলো বেশী কাবু। আপন স্রষ্টার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো বিচ্ছিন্ন। তাওহিদের চেরাগ বলতে গেলে নিভেই গিয়েছিলো।

সারা দুনিয়ার অবস্থাও ছিলো মোটামুটি এই। বিশদ বর্ণনার অবকাশ নেই। নইলে হিন্দুস্তান, চীন, মিসর প্রভৃতি দেশের নাম নিয়ে সে-সময়কার নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করা যেতো।

তবে আলাদা করে বলতেই হবে— এ-মহামারির প্রথম এবং বিশেষ শিকার ছিলো আরব।

কাব্য-সাহিত্যে নিশ্চিতই এরা ছিলো একক কৃতিত্বের অধিকারী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবারেও এরা বেশ অগ্রসর ছিলো। আরো কিছু চারিত্রিক গুণাবলী এদের মধ্যে দেদীপ্যমান ছিলো। যেমন বীরত্ব, সেনা-প্রতিভা, বদান্যতা ও মেহমানদারিতে আশ্-পাশে এদের জুড়ি ছিলো না। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টে আরেকটু সামনে অগ্রসর হোন। দেখবেন এরা ছিলো অন্ধ। বিবেকহীন। স্বেচ্ছাচারী। আজ একে লুন্ঠন করছে। কাল ওকে সাবাড় করে দিচ্ছে। নির্লজ্জতা আর বেহায়াপনা ছিলো 'গরবের ধন'। উলঙ্গপনা ও পর্দাহীনতা ছিলো এদের সেরা সংস্কৃতির অংশ। মদ-মদিরার আসর জমে উঠলে সন্ধ্যা শেষ হতো সে-ই ভোর ছুঁয়ে। জুয়ার বাজি লেগে

গেলে খোয়াতে হতো (ঘরের বউয়ের) কাপড় পর্যন্ত। রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ধারাবাহিকতা চলতো যুগ-যুগ ধরে। এর ভিতর হারিয়ে যেতো কতো জীবনের রস-গন্ধভরা যৌবন! বিনাশ হয়ে যেতো কতো গোত্র, বংশ ও পরিবার। তবু বেঁচে থাকতো জিঘাংসা! এই হলো ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষ সময়কার আরবের অবস্থা ও চিত্র।

* * *

এই আরবেরই প্রসিদ্ধ ও পবিত্র নগরী মক্কায় ৫৭০ খৃস্টাব্দে সুবহে সাদিকের বরকতময় সময়ে আরবের সবচে' সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আলোর নবী 'আল-আমীন'। যাঁর আলোতে ঝলমলিয়ে উঠেছিলো গৃহাভ্যন্তর। যা ছিলো এমন প্রখর ও তীব্র যে, এতে পূর্ব পশ্চিমের দিগন্ত রেখা-পর্যন্ত আলোকিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

আরবের ভৌগোলিক সীমারেখা আপনাদের জানা থাকারই কথা। ১২°—৩২° দ্রাঘিমা রেখা ও ৩৫°—৬০° অক্ষ রেখার পরিসীমায় অবস্থিত আরব বদ্বীপের একদিকে মিসর, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া), ত্রিপলী (লেবানন) ও আফ্রিকা মহাদেশ। আরেক দিকে রোম, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইউরোপ। তৃতীয় দিকে ইরাক, ইরান ও সমগ্র এশিয়া। আর চতুর্থ দিকে শুধু সাগর আর সাগর।

আবাদ পৃথিবীতে বিশেষত সে সময়কার সভ্য দুনিয়ার চৌরাস্তায় যেনো ছিলো আরবের অবস্থান। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্যের যে মহাসড়ক মাশরিককে (পূর্বাচলকে) মাগরিবের (অস্তাচলের) সাথে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করছিলো এবং ভারত সাগর ও পারস্য উপসাগর যে মহা সড়কের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য-সামগ্রী স্থল পথে মিসর, রোম ও সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছিলো, তা লোহিত সাগরের পাশাপাশি ঠিক যেনো একটি সরল রেখার ন্যায় আরবের পশ্চিম কিনারায় এসে মিশে গেছে।

ইতিহাস ও ভূগোল কি এ-ই সাক্ষ্যই দিচ্ছে না যে, শুধু আরবেরই নয়, পৃথিবীর সংস্কারের জন্যেও এ-ই সময়টিই ছিলো তাঁর জন্মের উপযুক্ত ও জরুরী সময়। আর ভৌগোলিক সীমারেখার দিক থেকে আরবের চেয়ে উপযোগী স্থান আর কোনোটিই ছিলো না। তাই স্থান-কাল উভয় দিক থেকেই এমন সৌভাগ্যময় জন্ম আর কী হতে পারে?

* * *

তাঁর সম্মানিত পিতার নাম 'আবদুল্লাহ'। তাওহিদ ও আবদিয়াতের প্রতি কী সুস্পষ্ট ইশারা! মুহতারামা মা জননীর নাম 'বিবি আমেনা'। যে নামের অর্থে লুকিয়ে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার শত প্রতিশ্রুতি! পৃথিবীতে চোখ মেলেছেন তিনি এতিম হয়ে। সোনা-মানিকের চাঁদমুখ দেখার আগেই চলে যেতে হয়েছিলো তাঁর সম্মানিত পিতাকে আখেরাতের অনিবার্য ও অনন্ত সফরে! যাঁকে হতে হবে সারা পৃথিবীর কাণ্ডারি, তাঁর কাণ্ডারিও তো হবেন তিনিই, যিনি সারা পৃথিবী নয় শুধু— কুল-মাখলুকাতের কাণ্ডারি! তাই এটাই স্বাভাবিক ছিলো যে, তাঁর জন্মের বাহ্যিক মাধ্যমটুকু ছাড়া আল্লাহ একেবারে প্রথম থেকেই তাঁকে একান্ত নিজের আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে বড় করবেন। আগামী দিনের রাসূল হিসাবে তৈরী করে তোলবেন। অন্য কারো অংশিদারিত্ব মেনে নেবেন না।

দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর ডাক নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ', 'সর্বোচ্চ প্রশংসিত' যার অর্থ। গুণবান মানুষের উপযুক্ত নাম। দ্বিতীয় নাম ছিলো 'আহমাদ'। যাঁর জীবন কেটেছে স্রষ্টার গুণ-কীর্তন ও প্রশংসায়। যাঁকে আখেরাতে দাঁড়াতেও হবে 'মাকামে হামদ' বা প্রশংসা-মঞ্চে, তাঁর জন্যে এরচে' ভালো ও উত্তম নাম আর কী হতে পারে?

অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে এমন এক শৈশবকাল কাটিয়ে ছিলেন তিনি, খোদ নির্মলতা ও নিষ্পাপতাও যে শৈশবের উপর গর্ব করতো। যৌবনে পদার্পণ করলেন যখন, তখন তাঁর সুকুমারবৃত্তি, পরহেযগারি, সত্যানুরাগ ও সৃষ্টির সেবা— তাঁকে ডাকতে লাগলো হাতছানি দিয়ে অবিরত!

এমনিতেই যৌবন হয় উন্মাদনা-উচ্ছল। তারপর আবার সে-ই দেশ, সে-ই সম্প্রদায়ের ভিতর, যেখানকার জীবনযাত্রা বিলাস-মাতাল। প্রবৃত্তিপূজারী। পাপাচার-অনাচারের সকল দরোজাই যেখানে উন্মুক্ত। যেখানে প্রতিটি উন্মাদ পদস্খলনের উপর প্রচলিত প্রথা ও 'ফ্যাশনের' মোহর মারা।

সে-ই পরিবেশে, সে-ই বয়সে জাহেলী যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর একদল বাসিন্দা তাঁকে উপাধী দিলো— 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত)। এই 'আল-আমীন' শব্দটি এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত, ইংরেজিতে শুধু 'virtoys' দ্বারাই এর তরজমা করা যেতে পারে। অর্থাৎ মুহাম্মদ একাধারে ছিলেন বিশ্বাসভাজন, সত্যবাদী, আনত দৃষ্টির অধিকারী এবং সবার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ।

আকৈশোর মেষ চরিয়েছেন তিনি। সামনে চলে যাঁকে উম্মতের রাখালি ও পাহারাদারির দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে, তাঁর জন্যে এ মেষ-রাখালি ছিলো কতো উপযোগী ও উন্নত শিক্ষা!

যৌবনে নেমেছেন তিনি ব্যবসায়।

ভবিষ্যতে যাঁর প্রধান ব্রত হবে সুলভ মুল্যে জান্নাতের 'শেয়ার সার্টিফিকেট' ব্যাপকভাবে বাজারজাত করা— তাঁর জন্যে যৌবনে বাণিজ্য পেশা কতোই না সঙ্গত ছিলো! তাঁর আমানতদারি, দিয়ানতদারি (ধার্মিকতা) এবং ব্যবসায় তাঁর অভিজ্ঞতা দেখে অঢেল সম্পদের অধিকারিনী এক পুণ্যবতী বিধবা তাঁর কাছে বিবাহের পয়গাম দিলেন নিজে। ২৫ বছর বয়সে এই গুণবান যুবকের দাম্পত্য জীবনও শুরু হয়ে গেলো। চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শুরু হলো তাঁর সৌভাগ্যময় জীবনের আরেক সফর, এতোদিন ধরে চলছিলো যার পূর্ব-প্রস্তুতি।

তেইশ বছর পর্যন্ত তিনি পৌঁছে গেলেন স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম— মানুষের কাছে। তিনি বিবাহ করেছেন একাধিক। তাঁর সন্তান-সন্ততিও ছিলো। স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে সত্যের খাতিরে, ইসলামের স্বার্থে বারবার তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড যুদ্ধে। প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে সন্ধি-চুক্তিও সম্পাদন করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর হাতে স্থাপিত 'ইসলামী খিলাফত'-এর সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি তাঁকে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হয়েছে।

কখনো তাঁকে বসতে হয়েছে বিচারপতির আসনে। কখনো বিবাহের মজলিসে।

অমুসলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও ছিলো তাঁর চিঠিপত্রের লেন-দেন।

অগণিত নামাজ আদায় করেছেন তিনি জীবনে। উম্মতের সামনে দাঁড়িয়ে কতো যে খুতবা ও উপস্থিত-বক্তৃতা দিয়েছেন, তার হিসাব আল্লাহই ভাল জানেন।

মোটকথা; দুনিয়ার প্রতিটি দিক সম্পর্কেই তাঁর অভিজ্ঞতা ছিলো। কিন্তু দুনিয়ার বেড়াজাল তাঁকে আটকাতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। যেনো কোনো ডুবুরী সাগরে ডুব দিয়ে উঠেছে, অথচ ভেজে নি তার একটি পশমও। যখন তেষট্টি বছর বয়সে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই বিলীয়মান দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তিনি, তাঁর হৃদয়ে জীবন্ত ছিলো 'সর্বোত্তম বন্ধু'র দীদার লাভের তামান্না! পবিত্র ও নির্মল ওষ্ঠযুগল থেকে ভেসে আসছিলো—

اَللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার সর্বোত্তম বন্ধু'-র আওয়াজ!

উম্মতের জন্যে রেখে গেছেন তিনি এই উপদেশ মালা—

'নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে দুনিয়ার বিশৃঙ্খলা ও জঞ্জালে ফাঁসাবে না। দুনিয়ার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণের ধোকায় পড়বে না। তবে নির্দ্বিধায় তা থেকে খিদমত নিতে পারো। কিন্তু ভরসা ও আস্থা রাখবে শুধু সেই অদেখা-মাওলার উপরই! তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা। জীবন তিনিই দেন। তিনিই মৃত্যুদান করেন। পুনরোত্থিত করবেন তিনিই। স্বীয় সত্ত্বায় কিংবা গুণাবলীতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি কাজে কর্মে দায়িত্ব-সচেতন হও। পার্থিব জীবনকে অস্তিত্বের ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত নগণ্য ও সীমাবদ্ধ একটি অংশ মনে করবে। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো কাজ করে তা-কে 'সবকিছু' মনে করে ধোকায় পড়বে না। এই 'আজ' সত্ত্বরই 'কাল' হবে। সেদিন দিতে হবে সবকিছুর পুঙ্খাণুপুঙ্খ হিসাব। সম্পন্ন করো সমস্ত প্রস্তুতি সে-ই সেদিনের জন্যে।'

আর উম্মতের জন্যে তিনি জারি করে গেছেন এই কানুন ও নীতিমালা—

'কোনো অবস্থায়ই জুলুম করো না। ছোট বা বড় হওয়া এই মাটির পৃথিবীর বুনিয়াদী কানুন। কেউ হবে আমির আর কেউ হবে ফকির। কিন্তু বড় দাবিয়ে রাখবে ছোটকে, আমির নিষ্পেষিত করবে গরিবকে, এবং শাসক শোষণ করবে শাসিতকে— এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্বামী-স্ত্রী, শাসক-শাসিত ও ধনী-গরিব সবাই অধিকার আদায়ের দাবিতে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে বরাবর। ফরয আদায়ের ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করবে। পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে আদায় করবে তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অধিকার আদায়ের নাম করে হাঙ্গামা ও হট্টগোল সৃষ্টি করবে না। দুনিয়াকে হাঙ্গামা ও অশান্তির নরক বানাবে না। তলোয়ার যদি হাতে ওঠাতে হয়, তাহলে তা যেনো হয় শুধু দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে। আল্লাহ্‌র হুকুমতের প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্যে। সুদ, ঘুষ ও খেয়ানতের এক- একটি পয়সাকে হারাম মনে করো। নির্লজ্জতার ধারে কাছেও যেয়ো না। অশ্লীল গান-বাজনা ও নৃত্য-গীতের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি মনে ঠাঁই

দেবে না। মাদকদ্রব্যে হাত লাগাবে না। 'মীরাস' বা উত্তরাধিকার বণ্টন করে দাও সমস্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঠিক হিসাব অনুযায়ী। এমন যেনো না হয় যে বড় ছেলেই পেয়ে গেলো সবকিছু আর ছোট ছেলে-মেয়েরা রয়ে গেলো শুধু মুখ দেখার জন্যেই। জুয়ার কামাইকে চুরির মালের মতোই পংকিল মনে করবে। অপরিচিতা ও বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টি পর্যন্ত তুলবে না। তবে নেহাৎ প্রয়োজন হলে এবং কোনো কল্যাণের খাতিরে ইসলামী শরীয়া মুতাবিক প্রত্যেকের হক ও অধিকার আদায়ের শর্তে একাধিক বিবাহের অনুমতিও রইলো।'

মোটকথা; এই সমস্ত হিদায়াত-বাণীকে আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে শেখে এবং শিখিয়ে যখন এই 'রাহবারে আজম' দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, তখন পৃথিবীতে রেখে গেলেন পরিপূর্ণ এক হিদায়াতনামা। দিয়ে গেলেন এক সর্বব্যাপী ও বিশদ কর্মপন্থা। তাঁর এই হিদায়াত ও শিক্ষার কথা তিনি যে কেবল বলেই গেছেন তা নয়, বরং তাঁর বাস্তব জীবনে রূপায়িত করেও দেখিয়ে গেছেন।

স্বগোত্রের মূর্খ ও সীমালঙ্ঘনকারীরা তাঁর পিছু নিলো, তখন দাওয়াতের কাজকে সফলতার দ্বার-প্রান্তে পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে দেশান্তরিত হতে হলো। আড়াইশ-পৌনে তিনশ মাইলের মরুপথ পাড়ি দিয়ে হিজরত করতে হলো মদীনায়। নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণের এমন কোনো দিক বাকি ছিলো না, যা তাঁকে এবং তাঁর ওফাদার সাহাবীদেরকে সইতে হয় নি। কিন্তু এ-সব কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অ-জাগতিক ইস্পাত কঠিন মনোবল ও হিম্মত দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলেন তিনিই। কুদরতি শক্তি তাঁর সামনে পানি করে দিল সব বাধার বিন্ধ্যাচল। আপন সান্নিধ্য পরশে তৈরী করে গেছেন লক্ষাধিক সাহাবীর এক মুবারক জামাত। প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন আরবে দশ লাখ বর্গমাইলের বিশাল ভূ-খণ্ডে ন্যায় ইনসাফভিত্তিক এক কালজয়ী আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা। তাঁর সর্বব্যাপী, বে-নজির সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও পূর্ণত্বের আকর সুমহান ব্যক্তিত্বকে কেবল আমাদেরকেই নয়, ইউরোপকেও স্বীকার করে বলতে হয়েছে—

The Most Successful of All Prophets and Rellgious Personal it's.

অর্থাৎ 'তিনি পৃথিবীর সমস্ত নবী-রাসূল এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সফলতম ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছেন।' [১]

তাঁর আনীত বে-নজির ও দৃষ্টান্তবিহীন কালামুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র কালামের জন্যেও এই ইউরোপই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—

"The most wideiy Read Book in Exibtence"

অর্থাৎ এ'রচে' বেশী প্রচারিত ও পঠিত কিতাব পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই'।[২]

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের মুখে এ-ই সশ্রদ্ধ প্রশংসা তিনি ছাড়া আর কে লাভ করতে পেরেছেন ?

---

১. এই বরাতের জন্যে দেখুন, "ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ১১ শ সং, ১৫শ খণ্ড-৮৯৮ পৃ

২. ঐ

রহমাতুল-লিল-আ'লামীন

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সব মানুষ পরস্পরে ভাই ভাই'। যাঁর কণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছিলো এই জান্নাতি পয়গাম, আজ তাঁরই জন্ম ও ওফাতের দিন। তিনি এসে পৃথিবীকে এ-পয়গাম দিয়েছিলেন ঃ বংশ-কৌলিন্য, বর্ণ-বৈষম্য ও দেশ-বিভাজনকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি করা অথবা কাউকে তুচ্ছ ও নিচু ভাবা— চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা। কেননা এ-সবই মানুষের ইচ্ছের বাইরে। মানব চরিত্রের সাথে, তার মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তিনি এ-ঘোষণাও দিয়েছিলেন—

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ.

'সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র পরিবার। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই প্রিয় যে তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে উত্তম আচরণ করে।'

-শু'আবুল ঈমান

স্নেহ-ভালোবাসার এ-পয়গাম্বরকে, সহানুভূতি ও মানবতার এ-সত্যবাদী পয়গাম বাহককে 'রহমতে আলম' না-বলে আর কী বলবেন?

তাঁর আরেকটি ঘোষণা হলো—

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. -رواه الترمذي وقال غريب ، وابن ماجه .

'জ্ঞান-বুদ্ধি তথা ইলম ও হিকমত তোমাদের হারানো সম্পদ—কুড়ানো মানিক। যেখানেই তোমরা তার সন্ধান পাবে, নিজের জিনিস ভেবেই তা কুড়িয়ে নেবে।'

এ ধারণা যেনো তোমাদের পেয়ে না বসে যে, এ-তো অপরের জিনিস, এতে কী করে আমরা হাত লাগাবো? কী করে আমরা কুড়িয়ে নেবো?

এ-সব হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা আজো কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিতের মুখে এক রকমের নতুন মনে হয়, আর সেই ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকে তো অবশ্যই! কেননা তখন দুনিয়া বিভক্ত ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে, পাড়ায়

পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়। সেই সাথে একে অন্যের বিরুদ্ধে খাড়া করে রেখেছিলো বংশভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক গোড়ামির দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সে-সময় ব্যাপক সহিষ্ণুতা ও সর্বাত্মক মানবতার শিক্ষা আরবের এক উম্মীর মুখে সত্যি ছিলো এক মু'জিযা। তিনি ঘোষণা করেছেন—

مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

'যে অন্যের প্রতি রহম করে না, সে নিজেও বঞ্চিত থাকবে রহমত থেকে'। স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার এই হুকুম কোনো গোত্র, কিংবা কোনো জাতির সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং গোটা মানব জাতির জন্যে। শুধু মানব জাতিও নয়, আল্লাহ্‌র সমস্ত মাখলুকাত ও সৃষ্টিলোকের জন্যে। যাতে শামিল রয়েছে আকাশচর, জলজ ও স্থলজ— সব প্রাণী। ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল, কবুতর, মুরগী সবই। আর কতিপয় হাদীসে তো নাম ধরে ধরে কিছু বাকশক্তিহীন প্রাণীর সাথে সদয় আচরণের উপর সুসংবাদ পর্যন্ত এসেছে। নবুওতি শিক্ষার উপর আমল হয়ে গেলে আজ যেমন প্রয়োজন দেখা দিতো না কোনো 'প্রাণী সংরক্ষণ বিল' বা 'প্রাণী নির্মমতা প্রতিরোধ সংস্থা' গঠনের অথবা দেখতে পাওয়া যেতো না রক্তাক্ত হয়ে-যাওয়া কোনো ঘোড়ার অথবা ক্ষত-বিক্ষত গরুর পিঠ।

আজ সেই 'রহমতে আলম'-এর জন্মের দিন, যাঁর আনীত আসমানী কিতাবের প্রথম পাঠই ছিলো— আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের সম্পর্ক সমস্ত সৃষ্টজীবের সাথে। তিনিই সব কিছুর একমাত্র পালনকর্তা। তিনি শুধু কুরাইশ গোত্রের আরবদের, কাফ্রিদের, গোরাদের কিংবা পূর্ব দেশীয় বা পশ্চিমাদের প্রতিপালক নন বরং ছোট বড়, আমির-ফকির, সবল-দুর্বল এমন কি জীব-জন্তুরও প্রতিপালক। অতি ক্ষুদ্র এবং দৃশ্যতঃ নিরর্থক কোনো সৃষ্টির, পাথরের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী অতি ক্ষুদ্র পোকা মাকড়েরও তিনিই প্রতিপালক। মানব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বরং বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা বিধানের এ শিক্ষা— এরচে' বেশী প্রভাব বিস্তারকারী ও হৃদয়গ্রাহী করে আর কিভাবে বলা যেতে পারে?

এই নূরে নবুওত যখন উজ্জ্বল হতে শুরু করলো, তখন দুনিয়া ঘুমিয়েছিলো তিমির আঁধারে। এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্বে মূর্খ আর অজ্ঞরা না-জানি কতো অংশীদার স্থির করে রেখেছিলো। মহা সত্যের মহাসংস্কারক তাঁর মহান

সংস্কার-কর্মের বুনিয়াদ রাখলেন প্রথমে তাওহিদের অমর বিশ্বাসের উপর। তিনিই সত্যিকারভাবে সরাসরি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে নবায়ন করলেন। নিশ্চিহ্ন করে দিলেন সকল প্রকার বাতিল মাধ্যমকে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতি নির্ভরতা থেকে উদ্ধার করলেন মানুষের আকল-বুদ্ধি ও মন-মানসিকতাকে। আকিদা-বিশ্বাসের বুনিয়াদি ইসলাহ ও সংস্কারের পরই বাস্তব জীবন গঠন ও তা পরিশুদ্ধকরণের দিকে তিনি নজর দিলেন। পেশ করলেন আল্লাহ্‌র হুকুমের সেই সব কানুন ও নীতিমালা, যা একদিকে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে করছিলো পরিশুদ্ধ ও সংশোধিত, অপরদিকে যাবতীয় নৈতিক অবক্ষয়ের বেড়াজালে আটকে পড়া সমাজ জীবনকে নিয়ে যাচ্ছিলো উত্তরণের সোনালী পথে।

শরাব ছিলো আরব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উঁচু তবকা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা ভাবতেই পারতো না এমন অনুষ্ঠানের কথা, যেখানে 'মদিরার জাম' ঘুরে-ঘুরে পরিবেশিত হবে না। বন্ধু-বান্ধবের আসরে, কুটুম্বিতার দাওয়াতে কিংবা কোনো খান্দানি উৎসবে মদিরা থাকতেই হবে। নইলে জিন্দাদিলী ও প্রাণবন্ততা বাকি থাকে কী করে? কিন্তু সেই মহাসংস্কারক এসে এই চিরাচরিত জাহেলি অভ্যাসের কবল থেকেও মুক্তি দিলেন তাদেরকে।

যারা ছিলো তখনও পর্যন্ত শরাবী-জুয়ারী-কাবাবী, আপন সান্নিধ্যের পরশে মুহূর্তের ভিতর তাদেরকেও বানিয়ে দিলেন তিনি— পবিত্র-নির্মল-সতর্ক-সাবধানী-আবিদ-তাহাজ্জুদ গুজার!

যুদ্ধোন্মাদনা, রক্তারক্তি, রণ-নৈপুণ্য বুঝি মিশেছিলো তাদের রক্তের কণায় কণায়। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বরং শতাব্দির পর শতাব্দি কেটে যেতো গোত্র ও পরিবারভিত্তিক রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পারস্পরিক শত্রুতা ছিলো যেনো বংশ পরম্পরায় চলে-আসা উত্তরাধিকার। রহমতের নবী এসে এই হিংসা-হানাহানি থেকেও পবিত্র করলেন প্রতিটি হৃদয়কে। যে হৃদয়ে জ্বলছিলো ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন, সেখানে সে হৃদয়ে বর্ষিত হলো মিল-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার 'পুষ্প বৃষ্টি'।

ন্যায়-ইনসাফ ও আল্লাহর-ভীতি এবং অধিকার আদায়ের কানুন ও নীতিমালার এমন এক শিক্ষা রেখে গেছেন তিনি, আজো তার উপর আমল হলে সারা দুনিয়া অশান্তি ও অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি লাভ করবে। পরিণত হবে দুনিয়াটা এক দৃষ্টিকাড়া কুসুম-কাননে।

চক্রবৃদ্ধি সুদের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দুনিয়া আজ হাবুডুবু খাচ্ছে, তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। গরিবের ভাগ্যের গ্রাস কেড়ে নেয়া এবং গরিবের রক্ত চোষা— সুদখোর ধনীর স্বভাবে মিশে গিয়েছিলো।

তারপর দুনিয়াতে যে সব রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ চলছে, একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই পরিস্কার হয়ে যাবে যে, যদি বড় অংকের সুদের ঋণ না মিলতো, তাহলে পৃথিবীতে এইসব ভয়ংকর ও মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ কিছুতেই বাধতো না। দুনিয়ার এই সত্যবাদী পথ প্রদর্শক, সত্য ধর্মের এ-পয়গাম্বর মানবতার সেই বিষাক্ত ধমনীও চেপে ধরলেন এবং আপন শরীয়তের মাধ্যমে তার মূলোচ্ছেদ করলেন। সুদ হাল্কা হোক আর ভারী, কম হোক আর বেশী— সুদী লেন-দেনের প্রতিটি দিক ও অবস্থাকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করলেন। কেননা সর্বাত্মকভাবে তা হারাম না-করা হলে এই আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

অশ্লীলতা ও অনাচার-ব্যভিচারের মহামারিও সর্বদাই জেঁকে বসে দুনিয়ার উপর। মিসর, গ্রীস ও রোমের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক চিকিৎসকও এ থেকে রেহাই পায় নি। অশ্লীল বাক্য, নগ্ন ছবি, বিশ্রী চিত্রাঙ্কন ও যৌনোদ্দীপক নৃত্যতাল—তার নোংরা আবেদন এবং তার অনিবার্য পরিণতি সব সময় মানুষের সুকুমারবৃত্তির সামনে ঐন্দ্রজালিক একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে বাকি আছে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর আনীত শরীয়ত জাহেলী যুগের এ-সব লাশসদৃশ মানুষের চেহারা থেকে রঙ্গিন ও দৃশ্যতঃ দৃষ্টিনন্দন খোলস আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে ফেললেন এবং সমস্ত ক্ষতিকর অংশকে সমূলে বিনাশ করে দিলেন।

এ-পয়গাম্বরের অন্য যে সব গুণ রয়েছে তা তো আছেই। তাঁর অসংখ্য গুণের ভিতরে আরেকটি গুণ এই যে, তিনি ছিলেন উঁচু পর্যায়ের অতুলনীয় বাস্তবধর্মী ও (Realist) সত্যানুরাগী। তাঁর সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি সর্বদা থাকতো বাস্তবতা ও সত্যের উপর। তাঁর আনীত শরীয়ত যতো হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান জারি করেছে, তা যেমন কবি-কল্পনার সবুজ-শ্যামল উদ্যান ছিলো না, তেমনি ছিলো না দার্শনিকদের প্রায় অপ্রয়োজনীয় দর্শন-প্রহেলিকা। তা ছিলো বিশ্ব মানবতার সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ, বাস্তবভিত্তিক সার্বজনীন দিক-নিদের্শনা।

নারীর অধিকার নিয়ে এবং নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথিবী বরাবরই বে-ইনসাফী ও অবিচার করে আসছে। কখনো নারীকে

এমন নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, যেনো বাইরের কোনো জীব এসে ঢুকে পড়েছে মানব সমাজে। আর কখনো তাকে এমন সামনে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেনো পুরুষ তার অনুগামী ও শাসিত। রহমতের নবী এসে নারীর যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, নারী কোনো অবস্থাতেই পুরুষের দাসী নয়। নারী পুরুষের মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রী। এ স-ব ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে রয়েছে তার বিশেষ বিশেষ অধিকার। সাথে সাথে নারীকেও পালন করতে হবে তার বাপের প্রতি, ভাইয়ের প্রতি, সন্তানের প্রতি ও স্বামীর প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গোলাম ও দাসদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত মনে করে আসছে পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ। ওদের দৃষ্টিতে 'লাঞ্ছনা' ও 'অপমান'-এর মূর্তিমান রূপ ছিলো যেনো এই দাসেরা। রহমতের নবী এসে দাসদেরকে মুক্তি দিলেন এ-অভিশাপ থেকে এবং গোলামদেরকে শুধু মানুষ হিসাবে আপন অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতাই দিলেন না, গোলাম-আযাদকে জড়িয়ে দিলেন 'ভাই-ভাই' সম্পর্কে।

তাই ইতিহাস বলে, গোলামদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে শুধু রাজা-বাদশা, আমির-উযির ও সিপাহসালারই নজরে আসছে না, অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ, ফিক্হ, হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমামও পাওয়া যাবে।

এতিম, অসহায়, বিকলাঙ্গ ও অসুস্থদের সাথে উত্তম আচরণ এবং সৌজন্য ও শিষ্টাচারের যে হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা সেই মহান পথপ্রদর্শকের আনীত কিতাবে এবং খোদ তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণীতে দেখতে পাওয়া যায়, তা এতো বেশী যে, একত্র করলে তা এক বিশাল-কলেবর কিতাবের রূপ নিবে। শুধু নমুনা হিসাবে একটি হাদীসের সারাংশ পেশ করা হচ্ছে—

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন—

'আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা যত্ন করো নি, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দাও নি'।

পেরেশান হয়ে বান্দা তখন আরয করবে— 'হে বিশ্ব জগতের স্বামী! এ কেমন করে সম্ভব? আপনার মহান সত্ত্বা তো অসুস্থতা ও ক্ষুধা থেকে চিরমুক্ত!' ইরশাদ হবে— 'অমুক অসুস্থ ব্যক্তিকে পাশ কেটে তুমি চলে গিয়েছিলে, সে তো আমিই ছিলাম! অমুক ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কথা তোমার কানে এসেছিলো, সেও তো আমিই ছিলাম'!

সত্যি কথা হলো এই যে, তাঁর নবুওতের উপর সকল প্রামাণ্য দলিল ও যুক্তির যদি অবলুপ্তিও ঘটে এবং তাঁর শরীয়তের শুধু এ-অংশটুকুই অবশিষ্ট থেকে যায়, যেখানে শুধু সাধারণ সৃষ্টিলোকের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণের কথা বলা হয়েছে, তাহলে শুধু একা এতোটুকুই তাঁর নবুওতের 'মু'জিযা'র জন্যে দলিল হিসাবে যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্‌র নবী যুদ্ধকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন নি, বরং কখনো এ-যুদ্ধকে করেছেন তিনি জায়েয (বৈধ), কখনো আবার ওয়াজিব। তবে অনেক কঠিন কঠিন শর্তও জুড়ে দিয়েছেন তিনি এর সাথে।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর অপরাধী, চোর-ডাকাত, খুনী, মদ্যপায়ী ও জুয়াড়িদের হাতে তিনি সাধারণ ক্ষমার 'পরওয়ানা' তুলে দেন নি। বরং বাস্তববাদী হিসাবে .. মহান সংস্কারক হিসাবে প্রতিটি ফোঁড়ার জন্যে পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি ও পৃথক পৃথক অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাপত্র তিনি দিয়ে গেছেন। তবে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মানদণ্ড খুবই উঁচু ও সতর্কতামূলক রাখা হয়েছে। এই নয় যে, এদিকে সন্দেহ হলো আর ওদিকে জারি হয়ে গেলো শাস্তির পরওয়ানা। মানব-প্রকৃতি নিজের ভিতরে বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো থেকে মুক্তি না পেলে, মানুষ অন্যায় রক্তপাতে নিজের হাত রঙ্গিন করলে, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার পাশাপাশি শাসন ও তিরস্কার এবং বাহবা-মিশ্রিত সান্ত্বনার পাশাপাশি সংশোধন মিশ্রিত উপদেশবাণীর সংমিশ্রণ শুধু অপরিহার্যই নয়— স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসার প্রকৃত দাবি পূরণের জন্যেও অপরিহার্য।

যাবতীয় সৎ গুণাবলীর আকর এ-মহান ব্যক্তি নিজের শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা দুনিয়াকে শুধু জান্নাতের নমুনাই বানিয়ে যান নি, বরং বাইশ তেইশ বছরের নবুওতি যিন্দেগীর ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্ময়করভাবে তার আমলী নমুনা ও বাস্তব রূপায়নও দেখিয়ে গেছেন এবং লাখ লাখ বর্গ মাইলের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে ন্যায় ও ইনসাফ, দয়া ও অনুগ্রহ এবং প্রেম ও ভালোবাসার সচিত্র রূপও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন— দোস্ত দুশমন সবার চোখের সামনে। আল কুরআনও যদি নীরব থাকতো, তবু তাঁর রেখে-যাওয়া কীর্তি ও অবদানের সাথে পরিচিত হওয়ার পরে মানুষের সুস্থ ও জাগ্রত বিবেকের ক্যানভাসে এই প্রশ্ন ভেসে ওঠা ছিলো খুবই স্বাভাবিক— এমন মানুষকে—নবীকে 'রহমাতুল-লিল আলামীন' না বললে বলবেন তাহলে কাকে?

এতিমের ওলী গোলামের মাওলা

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন ও ১১ হিজরীর রবিউল আওয়ালের খুব সম্ভব ১৩ তারিখ। রহমাতুল-লিল-আলামীন মদীনা থেকে তাঁর মূল নিবাসে ফিরে যাচ্ছিলেন। জীবনের একেবারেই শেষ মুহূর্ত। তাঁর বুক কাঁপছিলো। হঠাৎ নড়ে উঠলো তাঁর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয়। আশ্‌-পাশে যে সব প্রিয় সাহাবীরা খিদমতে হাজির ছিলেন, কান পেতে রইলেন তাঁরা— এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ওসিয়ত হতে পারে। ধারণা সঠিক ছিলো। ওসিয়ত হলো। কিন্তু তা ছিলো না প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী হযরত আয়েশা রা-এর উদ্দেশ্যে। ছিলো না স্নেহ-দুলালিনী ফাতেমার জন্যে। ছিলো না জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের কারো জন্যেও।

সংক্ষিপ্ত সেই ওসিয়ত ছিলো এই ঃ

الصلاة و ما ملكت أيمانكم

'সালাত এবং তোমাদের অধিনস্ত দাসদাসী'।

এই ওসিয়তের তাৎপর্য আসলে কী?

সালাতের ব্যাপরটি তো পরিস্কারই। কেননা সালাতই সবচে' উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সায়্যিদুল আম্বিয়াকে এর জন্যে তাকিদ দিয়ে যাওয়ারই কথা ছিলো।

কিন্তু এই 'গোলাম'! এর মানে কী?

জীবনের একেবারে চূড়ান্ত ক্ষণটিতে একটু ভাবলেন না পরিবারের কথা। ভাবলেন না সবেমাত্র স্থাপিত 'নবজাতক' রাষ্ট্রের কথা। বরং তাঁর সমস্ত ভাবনার—সব মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো, মজলুম অত্যাচারিত ও অপারগ এই গোলাম!

আল্লাহু আকবার!

এ গোলামের এক মহা সৌভাগ্য!!

ভেবে দেখুন, আবার ভেবে দেখুন!!

তৎকালিন পৃথিবীতে কী ছিলো গোলামের মর্যাদা ও অবস্থান? গোলাম শব্দটিই তো ছিলো তখন জ্বলন্ত লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যের প্রতীক! মিসর,

ইরান, গ্রীস রোম ও সমস্ত সভ্য দুনিয়া মিলেও তো এই গোলামকে গোলামী থেকে নাজাত দিতে পারে নি? কবি যদি এমন সর্বোচ্চ প্রশংসিত ব্যক্তির শানে বলেই ফেলেন

یتیموں کا ولی -- غلاموں کا مولا

'এতিমের অভিভাবক গোলামের বন্ধু'।

তাহলে নিশ্চয়ই এ কোনো কবিতা-উচ্ছ্বাস নয়, ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা বিবৃতিরই ঈমানী আবেগোচ্ছ্বাস মাত্র!!

মানবতার এ-মুক্তিদূত বলতেন— 'এ-গোলামরা তোমাদেরই ভাই। তোমরা যা খাও ওদেরকেও তাই খেতে দাও। তোমরা যা পরো, ওদেরকেও তাই পরতে দাও।'

প্রাক ইসলামী যুগে গোলামদের সাথে সাম্যের এ-অসাধারণ আচরণ ছিলো অকল্পনীয়।

যায়দ ইবনে হারিসার কাহিনী কার না জানা আছে? এক খৃষ্টান ঘরের সন্তান তিনি। শৈশব না-পেরুতেই এক যুদ্ধে ধরা পড়ে যান তিনি শত্রুর হাতে। হাকিম ইবনে হিযাম ছিলেন মা খাদিজার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনিই যায়দকে শাম থেকে গোলাম হিসাবে কিনে আনেন এবং এক সময় সে নবীজীর মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। এদিকে আল্লাহ্র রাসূল ঘোষণা দিয়েছিলেন নবুওত প্রাপ্তির। সাথে সাথে ঈমান কবুল করে ধন্য হলেন এই গোলাম যায়দ। আর রাসূলও তাকে মুক্তি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। ঠাঁই দিলেন পিতৃস্নেহের কোমল ক্রোড়ে। দিলেন তাকে সন্তানের মর্যাদা। ওদিকে তার পিতা প্রিয় যায়দকে হারিয়ে ব্যাকুল-অস্থির। খুঁজে ফিরছেন তাঁকে সর্বত্র। খবর পেয়ে অবশেষে এসে পৌঁছলেন মক্কায়। অতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি চাইলেন প্রিয় যায়দকে ফিরিয়ে নিতে। খোঁজে-ফেরা হারানো ছেলের দেখা মিললে কে না ফিরিয়ে নিতে চাইবে? আবেদন করা হলো নবীজীর কাছে। নবীজী তো আর বাবাকে 'না' বলতে পারেন না! যায়দের প্রতি শত স্নেহ-মায়া সত্ত্বেও তাই তিনি ভাঙা গলায় বললেন—'ওর ইচ্ছা' (গেলে যাক!)!

যায়দ তো স্বাধীন—মুক্ত! গেলে যেতেই পারে!! কিন্তু যায়দ কি গিয়েছিলো? না, যায়দ যায় নি! হ্যাঁ .. যায়দ পিতাকে সেদিন 'না' বলে দিয়েছিলো!! একেবারে পরিস্কার 'না'!! পৃথিবী সেদিন অবাক বিস্ময়ে এ-

দৃশ্য দেখেছিলো— আপন পিতা হেরে গেছে আপন পুত্রের কাছে! দীনের ভালোবাসা পরাজিত করেছে দুনিয়ার ভালোবাসাকে! নবীজীর প্রতি যায়দের ভালোবাসা বিজয় লাভ করেছে আর পিতার প্রতি তার ভালোবাসা 'মন খারাপ করে' বাড়ি ফিরে গেছে!

আসলে রাসূলের দামান ছাড়ার কথাও ছিলো না তাঁর। পারলেনও না ছাড়তে!!

রাসূলের স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা ঘিরে নিয়েছিলো তার জীবন!

এ-স্নেহ-মমতা, এ-মধুর আচরণ এবং গোলামকে এমন মর্যাদা প্রদান যদি না হয় কোনো ই'জাযপূর্ণ মহান কীর্তি— তাহলে আর কী হবে?

আবু মাসউদ নামে এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। দেশের সাধারণ প্রচলন হিসাবেই একদিন তিনি নিজের গোলামকে প্রহার করছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে আওয়ায এলো—

'আবু মাসউদ! এ-গোলামের উপর তোমার যেমন অধিকার রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার রয়েছে তোমার উপর আল্লাহ্‌র'। সাহাবী ঘুরে দাঁড়ালেন! দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক রহমাতুল-লিল-আ'লামীন!! তাঁর এ-সংক্ষিপ্ত ও বাগ্মিতাপূর্ণ ওয়াজের ভীষণ প্রভাব পড়লো সে-সাহাবীর জীবনে। তিনি প্রহার বন্ধ করে তৎক্ষণাত সে-গোলামকে আজাদ করে দিলেন!

এক সাহাবী রিওয়ায়াত করেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলাম— 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অধীনস্ত গোলামকে কতোবার মাফ করবো?

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আল্লাহ্‌র নবীর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো— 'প্রতিদিন সত্তর বার'!

রহমাতুল-লিল-আ'লামীনের এ-স্নেহ ও দয়ার কোনো সীমা আছে কি? এই 'গোলাম' শব্দের কারণেই তখন গোলামরা নিজেদেরকে ছোট ও নীচ ভাবতো। তাদের কাছে মনে হতো— এ-শব্দের ভিতরেই যেনো লুকিয়ে আছে অপমান ও লাঞ্ছনার এক অভিশপ্ত দুনিয়া। সৃষ্টির মহান শিক্ষক গোলামদের এই হীনমন্যতার পুরা অবস্থা ও বাস্তবতা লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন—

لا يَقُولَنَّ أَحَدُكم عَبْدِي وأَمَتِي ولكن فَتايَ وفَتاتي.

'কেউ যেন এদেরকে, 'আমার দাস' 'আমার দাসী' না বলে। বরং 'আমার পুত্র' অথবা 'আমার কন্যা' বলে ডাকে'।

প্রিয় পাঠক! এতিমদের কথা আর বলার প্রয়োজন আছে কি? ইতিহাসের পাতা মেলে দেখুন! সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে এবং আরবে বিশেষভাবে রাসূলের সোনালী যুগের পূর্বে কী ছিলো এতিমদের অবস্থা? আর কী অবস্থা হয়েছিলো তাঁর পুণ্য যুগে? রহমতের নবী এতিম-মিসকিন-অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে করে তাদেরকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন যে, 'এতিম হওয়া' —হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার বদলে— রীতিমত গৌরবের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেলো! স্বয়ং রাসূলই তো ছিলেন এতিম মানিক! অর্থাৎ এমন মহামূল্যবান ও সুন্দরতম মোতি, যা লুকিয়ে থাকে ঝিনুকের ভিতরে একা একা! শৈশবেই তিনি এতিম হয়েছেন দ্বিতীয় বারের মতো বরং তৃতীয় বারের মতো। পিতার মুখ তো দেখতেই পান নি তিনি! আর মাতৃমমতার স্নিগ্ধ ছায়াটাও উঠে গিয়েছিলো ছয় বছর বয়সেই। আর আট বছর বয়সে হারালেন— দাদা জানের স্নেহ-ছায়াটুকুও!

তিনি পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে জগতবাসীকে এ-পয়গামই দিয়ে গেছেন— 'যে ব্যক্তি নিজ পানাহারে কোনো এতিমকে শরীক করলো এবং তার ব্যয়ভার বহন করলো, হাশরের দিন জাহান্নামের আগুন এবং তার মাঝে পর্দার আড়াল তৈরী হয়ে গেলো'।

শুনিয়েছেন তিনি এ-সু সংবাদও— 'যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, এতিমের মাথায় যতো চুল ততো নেকি লেখা হবে তার আমলনামায়।'

আরো বলেছেন— 'মুসলমানদের পাড়ায় ও মহল্লায় সবচে' উত্তম ঘর সেটি, যেখানে ভালোভাবে প্রতিপালিত হয় কোনো এতিম শিশু'।

এমনকি তিনি এও বলে গেছেন— 'এতিমের লালন-পালনকারি জান্নাতে আমার এতো কাছাকাছি থাকবে যেমন কাছাকাছি থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল'।

صلى الله عليه وسلم

তোমার স্মরণে হে রাসূল!

ঈসায়ী ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ এবং দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান। মদীনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযানে একটি কাফেলা একটি বড় ময়দানের দিকে যাচ্ছিলো। দূরত্ব তেমন ছিলো না, চার ক্রোশ থেকে আরো কম। কাফেলার লোকসংখ্যা ছিলো তিনশ'র উপর। উট ছিলো মোট একশ। একটি উট পড়েছে তিন জনের ভাগে। একই সময়ে দু'জনের বেশী সওয়ার হওয়ারও উপায় ছিলো না। তাই তিন জনের একজনকে অপরিহার্যভাবেই হেঁটে পথ চলতে হচ্ছিলো পালাক্রমে। এই একই নিয়ম কাফেলার সরদারের ক্ষেত্রেও। আর তিনি ছিলেন বয়সে প্রৌঢ়, এই তিপান্ন কি চুয়ান্ন তাঁর বয়স। অপর দুই যুবক বয়সে তাঁর চেয়ে বেশ ছোট।

অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে—আনুগত্যের একরাশ আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে অপর সঙ্গীদ্বয় তাঁর কাছে আরয করলেন—

'মুহতারাম সরদার! আমরা উভয়েই সানন্দে আমাদের পালা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি! হেঁটে যেতে আমাদের কষ্ট হবে না, সুতরাং আমাদের পরিবর্তে আপনিই সওয়ার হয়ে আমাদেরকে বাধিত করুন'!

হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত কণ্ঠ!

মনের গভীরে লালিত বিশ্বাস!

অনুরাগ-দ্যুতিত আবেদন! আগেই বলেছি; বয়সেও ছিলেন যারা তাঁর ছোট! কিন্তু কী জওয়াব দিয়েছিলেন মুহতারাম সরদার?

শুনুন! আমাদের আপনাদের সরল ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় এই—

'তোমরা তো আমার চেয়ে আর বেশী শক্তিশালী নও! (তোমরা হেঁটে চলতে পারলে নিশ্চয়ই আমিও পারবো!) তাছাড়া পায়ে হেঁটে সফর করলে যে সওয়াব হবে, তা তোমাদের যেমন প্রয়োজন, আমারো তেমন প্রয়োজন'!

জওয়াব আপনারা শুনলেন তো? এই বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির রাজা-বাদশারা, নেতা-কর্তারা জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে যে রাজকীয় শান-শওকত ও ধুমধামের সাথে সফর করে থাকেন, সে চিত্র কমবেশী

আমাদের সকলেরই জানা। সেই চোখ ঝলসে-দেয়া চিত্রকে একটু কল্পনা করে ভাবুন তো— মহান সরদারের এ-সাদামাটা জওয়াবের কথা! দেখুন একটু তুলনা করে—পরখ করে! দেখেছেন? এবার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো— গর্বে বুক ফুলে উঠে নি আপনার? আপনার হৃদয়ের কুসুম-কাননে পাঁপড়ি মেলে তাকায় নি আনন্দ ও খুশীর ঘুমন্ত কুসুম-কলিরা?

একজন মানুষ হৃদয়ের আবেগ ঝরিয়েছেন এভাবে—

چشم بروے اوکشا باز بہ خویش نگر

'একবার আঁখি নিমীলন করুন তাঁর দিকে,
পুনঃঅবলোকন করুন নিজেকে।'

* * *

নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন সওয়াল-জওয়াবের মর্ম!

কাদের মধ্যে ছিলো এ-সওয়াল-জওয়াব? ... আবদার জানিয়েছেন জীবন উৎসর্গ করার সমস্ত মনজিল পেরিয়ে-আসা দুই নওজোয়ান সাহাবী! আর জওয়াব দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ সংক্ষিপ্ত জওয়াবে তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন শিক্ষার কী বিশাল রত্নভাণ্ডার!

এ শিক্ষা সম্মানের শিক্ষা!
এ শিক্ষা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার শিক্ষা!
এ শিক্ষা স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার শিক্ষা!
এ শিক্ষা ন্যায় ও সাম্যের শিক্ষা!
এ শিক্ষা আল্লাহ্র সামনে দাসত্বের মাথা অবনমিত করার শিক্ষা!
এ শিক্ষা তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা!
এ শিক্ষা পরকালে সওয়াব ও পুণ্যের আশায় বুক বাঁধার শিক্ষা!

* * *

এই হলেন সেই প্রিয়তম ব্যক্তি, দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক। যাঁর বার্ষিক স্মরণ সভায় আমরা সমবেত হয়েছি। কিন্তু আমি ভেবে হয়রান হই— আল্লাহ্র এই প্রিয়তম বান্দার স্মরণ বছরে একবার কেনো? বছরের প্রতিদিন ব্যতিক্রমহীনরূপে হওয়া উচিত, প্রতিদিনও একবার নয় পাঁচ বার।

'অসংখ্য দুরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি'।

বদর প্রান্তরের দৃশ্য একটু কল্পনা করুন তো! একদিকে কোরাইশ বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে সব ধরনের যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছে। ঘোড়া বলুন, উট বলুন, রসদপত্র বলুন, কিংবা ক্ষুরধার চকচকে তরবারির কথাই ধরুন, সব আছে তাদের। অভাব নেই কোনো কিছুরই।

আর ওদিকে—আল্লাহ্র পথের সৈনিকেরা ধরতে গেলে সব দিক থেকেই নিঃস্ব। বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জামের তীব্র সংকট! আর সৈন্য সংখ্যা?

এদিকে একজন ওদিকে তিনজন!

এদিকে তিনশ তের, ওদিকে এক হাজার!

কিন্তু তাঁদের ছিলো শাহাদতের সবুজ তামান্না! তাঁদের ছিলো আল্লাহ্র প্রতি অটল, অবিচল আস্থা! ছিলো বীরত্ব! আরো ছিলো দৃঢ়-চেতা মনোভাব! যেনো 'একেকটা বীর শার্দুল'! পিছপা হলেন না আল্লাহ্র নবী। মুকাবিলা করেই ছাড়লেন তিনি। আগামী দিনের বিশ্বের ঈমানদার বীর সন্তানদের জন্যে রেখে গেলেন হিম্মত ও প্রেরণা লাভের এক কালজয়ী ইতিহাস!!

১৭ই রমজান শুক্রবার, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের রাতে দেখা গেলো— এই বীর পুরুষ বসে আছেন এক কোণে—তাঁর বিশেষ ছাউনিতে! রহমানের দরবারে আকুল প্রার্থনায় মশগুল! কান্নার উচ্ছ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বিগলিত হৃদয়ের আকুতি রাঙাময় হয়ে উঠছে তাঁর কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে। 'ইলাহী! পূর্ণ করবে না তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি! ইলাহী! আর কিছু চাই না, চাই শুধু তোমার নুসরাত!'

আল্লাহ! আল্লাহ!

হিম্মত ও সাহসিকতার কথা তো আগেই শুনেছেন!

এবার দেখলেন তো তাঁর দাসত্বের ঝলক!

তাঁর আল্লাহ-ভীতি!

তাঁর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের চিত্র!

জীবন ও কর্মের কতো গভীরতা থেকে বদরের ঘটনার কারণে পর্দা সরে গেলো! চরিত্র, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, মারেফাতে ইলাহীর কতো শিক্ষা এই এ-ঘটনার ভিতর মিলে গেলো!

* * *

ইতিহাসের পাতা আরেকটু উল্টে যান।

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাস। সম্মিলিতভাবে সমস্ত দুশমনরা মদীনা আক্রমণের শপথ নিয়েছে। কুরাইশরা তো নিজেও কম শক্তিশালী ছিলো না। তবু এবার নিজের সাথে জুড়ে নিলো অন্যান্য যুদ্ধবাজ কবিলাগুলোও। তদুপরি তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে অভিশপ্ত ফিতনাবাজ ইহুদী জাতি। এই টিড্ডির দল এসে চারদিক থেকে মদীনা ঘিরে ফেললো। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শহরের বাইরে অভিনব উপায়ে এক খন্দক খননের পরিকল্পনা হাতে নিলেন নবীজী।

সামরিক লক্ষ্যে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে খন্দক খননের অভিজ্ঞতা কার ছিলো? প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রা. এর প্রস্তাব অনুযায়ী রাসূলের দিক-নির্দেশনা মতোই কাজ আরম্ভ হলো। প্রয়োজন হলো না কোনো ভূ-তাত্ত্বিকের। কোনো বিশেষ বাহিনীর। কিন্তু কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন একজন সুদক্ষ প্রকৌশলীর মতোই।

কী আজিব দৃশ্য! রাসূল নিজেও সবার সাথে হাতে তুলে নিলেন বেলচা ও কোদাল! খনন কাজ করে যাচ্ছেন অন্য সকলের মতো। প্রাণোৎসর্গী সাহাবীদের 'না' 'না' সত্ত্বেও! পুরা শহর অবরুদ্ধ। বাইরে থেকে রসদ পত্র আসার পথটুকুও বন্ধ। খাদ্যাভাব দেখা দিলো ভয়ালরূপে । ক্ষুধার তীব্র জ্বালা সইতে না পেরে পেঁটে পাথর বেঁধে আছেন পরিশ্রান্ত সাহাবীরা। আল্লাহ্‌র নবীর অবস্থা আরো করুণ। তিনি এক-এর জায়গায় বেঁধে রেখেছেন দু'টি পাথর।

দেখলেন তো? দুনিয়ার কোন্ সিপাহসালার অধিনস্ত সৈনিকদের কাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করবেন এমন করে? যখন তিনি অন্যদের চেয়ে বেশী ক্ষুধার্ত এবং কাজেও অন্যদের চেয়ে বেশী অগ্রগামী? সেই সাম্যের ছবি আবার কেমন? নজরে আসছে নিজ অধীনস্ত সিপাহীদের মধ্যে এ-কাজে বিজয়ী প্রমাণিত হওয়ার চিত্র! যিনি রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সবচে' ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানীদের কাতারে সবচে' বড় জ্ঞানী, এবং আসমানী ইলমের আলেমদের সারিতে সবচে' বেশী অভিজ্ঞ ও সম্মানিত। তিনি কুলি-মজুর ও কামলাদের বেশেও কী দারুণভাবে সফল প্রমাণিত হলেন!!

তাঁর পবিত্র ও মুবারক জীবনের সারকথা এই দু'য়েকটি ঘটনার ঝলকেই আলোকোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এখন এর ব্যাখ্যা দিলে কিংবা ঘটনাকে বিশ্লেষণাত্মক আকারে বিবৃত করলে— মিনিট ও ঘন্টা কেনো, প্রভাত হয়ে

যাবে রজনী, আবার রজনী হয়ে যাবে ভোর, আবার .... তবু শেষ হবে না তাঁর মহৎ গুণাবলী!

তিনি আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছেন সবচে' বেশী। তাঁর হৃদয় জুড়ে আল্লাহ্‌র আযমাত ও মাহাত্ম্যও ছিলো সবচে' বেশী। আল্লাহ্‌র প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো তাঁর হৃদয়-মন। প্রত্যেকের অধিকার বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। অত্যাচারিতের দিকে বাড়িয়েছেন তিনি সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত। ব্যথিত জনের ব্যথার হয়েছেন সমভাগী। হয়েছেন অক্ষম-অভাবীদের সাহায্যকারী।

৩০শে এপ্রিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মুতাবিক ১২ই রবিউল আওয়াল (হিজরতের ৫২ বছর পূর্বে) এ-পৃথিবীকে মঙ্গল ও কল্যাণের আলোয় আলোকোদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। ৮ই জুন ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুতাবিক ১২ই রবিউল আওয়াল ১১ হিজরীতে মদীনা থেকে নিজের সর্বোত্তম বন্ধু ও মাওলা আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান।

চন্দ্রমাস অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। তাঁর নবুওতের জীবন ছিলো ২৩ বছর। প্রথম ১২ বছর কেটেছে দাওয়াত ও প্রচারের কাজে— আরবের বন্য, বর্বর ও অবাধ্য এক জাতির ভিতর।

মুসলমানরা তাঁকে নাজাতের ওসীলা মনে করে এবং তাঁর শানে গেয়ে চলে এই প্রশস্তি—

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

'সব কথার শেষ কথা— খোদার পরই তোমার মর্যাদা ও আসন'।

আর তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, সাহসিকতা, ভদ্রতা, উন্নত চরিত্র, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা, উদারতা ও বদান্যতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাক্ষ্য যেমন দিয়েছে দূর-অতীতের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তেমনি দিয়ে চলেছে— ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় নামী-দামী পণ্ডিত ও মনীষীরা।

তাঁর প্রশস্তি গেয়ে কবিতার ভাবাবেগপূর্ণ ভাষার সরোবরে সাঁতার কেটেছেন— এমন হিন্দু ও অমুসলিম তালাশ করলে, দশ, বিশ কিংবা পঞ্চাশ নয়, শত শত নাম জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকবে! তাঁর নামের মাহাত্ম্য গুঞ্জরিত হচ্ছে তেরশ' বছর ধরে প্রতিদিন পাঁচবার— পৃথিবীর সর্বত্র। দশ বছরের এক সীমিত সময়ে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি এক মহান ইনকিলাব। স্থাপন করেছিলেন ১২ লাখ মাইলের বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে

কালজয়ী এক আদর্শ—ইসলামী খিলাফত। তাও আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অবিরাম কোনো সংগ্রামের পথ ধরে নয়—লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানকে নিধন করে নয়, বরং শুনে অবাক হবেন যে, শত্রুদের সাথে তাঁর যে সব যুদ্ধ হয়েছে তাতে দু'দলের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা এক হাজার আঠার জন। ২৫৯ জন শহীদ হয়েছেন তাঁর লোক। আর ৭৫৯ জন নিহত হয়েছে শত্রু পক্ষের।

তাই তো 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র এগারতম সংস্কারণে বলা হয়েছে—

'The Most successful of All Religious Personalities'
'ধর্মীয় পণ্ডিতদের ভিতরে তিনিই সবচে' সফল ব্যক্তিত্ব'।

আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে সে গ্রন্থের ভাষ্য হলো—

'The most wideiy Read Book in the World'
'এর চেয়ে বেশী পঠিত কিতাব পৃথিবীতে আর নেই'।

আর যে উম্মত তাঁর নামের কালেমা পড়ে, তাদের সংখ্যা হলো ৬০ কোটি।[১]

বন্ধুগণ! বলুন তো; এমন যাঁর জীবন সে জীবনকে একটি পৃথক ও ধারাবাহিক মু'জিযা না বললে কী বলবেন?

صلّی اللّه علیه وآله وسلّم

সমাপ্ত

১. বর্তমান হিসাবে পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা একশ বিশ কোটিরও উপরে।

মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একসঙ্গে ৮ জন নারী সাহাবীর জীবন কথা নিয়ে...

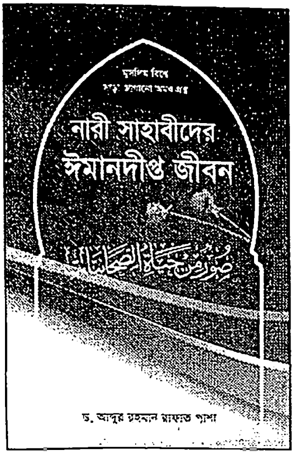

মূল : ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদক : মাওলানা মাসউদুর রহমান

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন
ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ–মাওলানা মাসউদুর রহমান

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা। কালজয়ী ইসলামী সাহিত্যিক। যার অমর রচনাবলী সমৃদ্ধ করেছে জগৎজোড়া ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে। রাহনুমা প্রকাশনী থেকে বাংলায় এটি তাঁর অনবদ্য সাহিত্য কর্মের দ্বিতীয় আয়োজন। লেখক তাঁর এই গ্রন্থেও ইসলামের সোনালী যুগের স্বর্ণালী সময়কে উপস্থাপন করেছেন কলমের জাদু, ভাষা-সাহিত্য আর অলংকারের মিশেলে। ১০০০ বছর আগের সমাজ-বাস্তবতা আর ইসলামের নারী-আদর্শকে তুলে ধরেছেন তার নিজস্ব ও প্রাণস্পর্শী রচনাশৈলীতে। এ গ্রন্থে লেখকের সবার্ধিক মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে নবী জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ অসংখ্য নারীর মধ্য থেকে মাত্র ৮ মহিয়সী নারীর নির্বাচনে। এই নারীদের মাধ্যমে যেন তিনি বলে দিয়েছেন প্রিয় নবীর পূর্ণ জীবনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। বলেছেন নারীর সকল রূপ অর্থাৎ মা, মেয়ে, স্ত্রী'র ইসলামী ভূমিকা ও অবদানের কথা। তাদের অধিকার ও কর্তব্যের কথা।

আমাদের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি যারা পড়েছেন তাদের কাছে এ বইটির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ঐসকল পাঠকের বিশাল অংশ ইতিমধ্যেই এই বইটির জন্য তাদের অধীর অপেক্ষার কথা আমাদের জানিয়েছেন। আর যারা সেটির মাধ্যমে লেখকের রচনাশৈলীর সাথে পরিচিত হন নি তারা ভেবে দেখুন কোন বইটি পড়বেন আগে আর কোনটি পরে।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রা
রাহনুমা প্রকাশনী
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯।
যোগাযোগ ঃ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫

সারা বাংলাদেশের পাঠকমহলে অল্প সময়ে আলোড়ন
সৃষ্টিকারী দু'টি গ্রন্থের একটি...

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একসঙ্গে ৩৭ জন তাবেঈর জীবন কথা নিয়ে...

মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

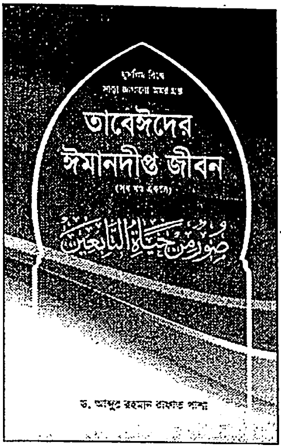

মূল : ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদক : মাওলানা মাসউদুর রহমান

যারা প্রাণপ্রিয় রাসূল স. এর সাহাবীদের সোহবত-সান্নিধ্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহ্ তাআলার সকল ফয়সালায় ছিলেন পূর্ণ সমর্পিত, সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় তাঁরই হুকুম পালনে তৎপর, এলেম হাসিলের জন্য যাদের সর্বস্ব ছিল উৎর্সগিত, যাদের রাত কাটত জায়নামাযে রোনাজারিতে আর দিন কাটত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ময়দানে জানবাজিতে। সেই সকল বিখ্যাত তাবেঈর ঈমানদীপ্ত জীবনের আলোকিত ৩৭টি চিত্র এক সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এই অনুবাদ গ্রন্থে।

মূল গ্রন্থ 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন', লেখক বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা। গ্রন্থটি ইসলামী মানস ও নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনে ব্যাপক কর্যকর বিবেচিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসভুক্ত।

অনুবাদক মাওলানা মাসউদুর রহমান অনুবাদে মূল আরবীর আকর্ষণীয় ভাষা, চমৎকার সাহিত্য আর শব্দালঙ্কারের অপূর্ব সৌন্দর্যকে সফলতার সঙ্গে তুলে এনেছেন সযত্ন প্রচেষ্টায়।

মূলের ভাব-ভাষার অতুলনীয় স্বাদ-গন্ধ, সুর-ছন্দ সবই অনুরণিত শক্তিশালী এ অনুবাদে। এ গ্রন্থে রয়েছে সুরভিত কোমল ফুলের পাপড়ি, নির্মল আকর্ষণীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, জিহাদী জীবনের তির-তরবারির ঝনঝনানি, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম নির্যাতন, উমর ইবনে আব্দুল আযীযের ইনসাফপূর্ণ শাসন, উমাইয়া শাসকদের জৌলুসপূর্ণ ভোগের জীবন, আসহাবে রাসূলের শিষ্য শাগরেদদের দরবেশি জীবনের হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা। তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনের দীপ্তিগাঁথা আমাদের জীবনকে করুক আলোকিত। দুনিয়ার মোহ মায়ায় জড়ানো আমাদের মহাভ্রান্তি হোক অপসারিত। জান্নাতী জীবন গঠনে এ গ্রন্থটি হোক আমাদের প্রেরণার উৎস।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রা
রাহনুমা প্রকাশনী
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯।
যোগাযোগ ঃ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. সম্পর্কে আরব উলামা-মাশায়েখ ও লেখকদের মন্তব্য :

‘শায়খ নদভী .. ইসলামের মহান দাঈ! ইসলামের পক্ষে আজীবন লড়াই করে গেছেন, কখনো কলমের ভাষায় কখনো মুখের ভাষায়! তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভব-উপলব্ধি ছলছল প্রবাহে বহমান ছিলো সঠিক ও স্বচ্ছ ধারায়! সমন্বয়ের প্রশ্ন এলে তিনিই ছিলেন সেরা সমন্বয়কারী! তিনি নববী বংশধারার নির্যাস! তিনি মুহাম্মদে আরাবী’র পরিবারের সদস্য!’ -আবদুল আযিয আল-মোবারক

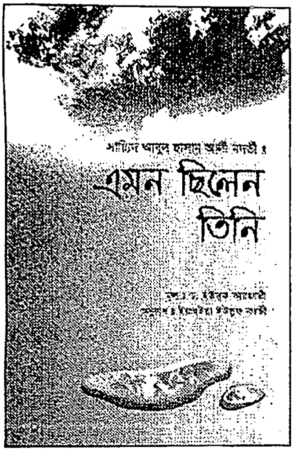

মূল : ড. ইউসুফ কারজাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

‘শায়খ নদভী .. আল্লামা! দাঈ, উম্মাহর অমর প্রাপ্তি, উম্মাহর অফুরান ভালোবাসা!’
-আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

‘শায়খ নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের মহা সম্পদ। তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে ভাস্বর তাঁর লেখা ও গ্রন্থনা। ইসলামী শরীয়তের গভীর রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বড়ো গভীর করে! মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিতই করেন নি তিনি শুধু, দরদী বন্ধুর মতো বাতলে গেছেন তার সমাধানও।’
-ড. মোস্তফা আস সিবাঈ রহ.

‘শায়খ নদভী .. উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষ! তাঁকে জেনেছি আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে .. তাঁর কলমে। তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি মু’মিনের হৃদয়, মু’মিনের জ্ঞান, মু’মিনের প্রজ্ঞা। হ্যাঁ .. তাঁর ভিতরে দেখেছি আমি উম্মতের কল্যাণ-চিন্তায় নিবেদিত এক মহান পুরুষকে। ভাবতেন তিনি শুধু ইসলামকে নিয়ে, শুধু ইসলামের জন্যে, শুধু ইসলামের স্বার্থে। এ ছিলো তাঁর জীবনের সবচে’ বড় প্রত্যয় ও অঙ্গিকার। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেই বলতে পারি এ আমার অকপট সাক্ষ্য।’ -সায়্যিদ শহীদ কুতব রহ.

‘তাঁর লেখক-সত্ত্বায় রয়েছে অপরূপ রূপময়তায় কারুকার্যময় এবং অপূর্ব নন্দনতত্ত্বে উদ্ভাসময় এক ব্যতিক্রমী ধারা ও ‘স্টাইল’। যা বলতে চান তিনি তা বলেন বড়ো দক্ষতায়, বড়ো হৃদয়ছোঁয়া ভাষায়।’ -আনোয়ার আল-জুনদি

‘শায়খ নদভী .. ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াতের তরে জীবন বিলিয়ে-দেয়া এক মহান পুরুষ। তাঁর জীবন প্রবাহ, তাঁর সূচনা-সমাপ্তি, তাঁর শুরু-শেষ সবই ছিলো শুধু ইসলামকে কেন্দ্র করে .. ইসলামের দাওয়াতকে ঘিরে।’ -মুহাম্মদ আবদুহু ইয়ামেনী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রা
রাহনুমা প্রকাশনী
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯।
যোগাযোগ ঃ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫

পাঠ প্রতিক্রিয়া

অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা

ইয়েমেনে একশত বিশদিন

'ইয়েমেনে একশত বিশদিন' নামের মধ্যেই বইটির পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে আছে। মাসিক আলকাউসার-এ এ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্ব ছাপা হয়েছিল। তখন নাম ছিল 'ছিত্তানফর মিন বাংলাদেশ'। একটি তাবলীগ সফরনামা যে এতোটা প্রাঞ্জল ও মধুর হতে পারে লেখাগুলো পড়ার আগে মনেই হয়নি। তাবলীগ জামাতের সঙ্গে লেখক গিয়েছেন ইয়েমেন। ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি আরব দেশ। সেখানে তিন চিল্লা বা একশত বিশদিন তিনি কাটিয়ে এসেছেন। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, তাবলীগের সফরগুলো সাধারণত একরকমই হয়। রুটিন জীবন। পরিচিত বাঁধাধরা কর্মসূচী। কিন্তু এ বইটি পড়ার পর অনুভূতি হয়েছে অন্যরকম। দাওয়াতী কাজের সঙ্গে টার্গেট সমাজ ও মানুষকে গভীরভাবে অবলোকনের একটি আর্কষণীয় চিত্র বইটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ইয়েমেনের জীবনে ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা, বিচিত্র মানুষ ও জীবন, স্থানীয় সংস্কৃতি ও আচরণ, খাবার ও পোশাক, আদব-কায়দা ও চালচলন, মরুভূমি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহল জাগানিয়া প্রাঞ্জল গদ্যে লেখক আলোচনা করেছেন। একঘেয়েমি কিংবা ব্যাকরণিক ফরমূলায় পরিচিত তুলে ধরার ধারা এড়িয়ে গল্প বলার ভঙ্গিটি অবলম্বন করায় লেখক সফলভাবে এতে পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

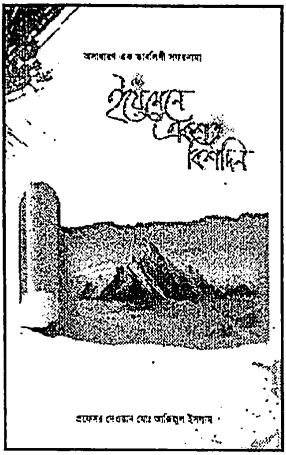

অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা
লেখক ঃ দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

তাবলীগের বিদেশ সফর নিয়ে বাংলাভাষায় রচিত এটি সম্ভবত প্রথম বই। এদিক থেকেও এর একটি বিশেষত্ব রয়েছে। দ্বীনদার ও দ্বীনের দাঈ একজন উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশীর সঙ্গে ইয়েমেনের মরুময় ও দ্বীনী চেতনায় উজ্জীবিত সাধারণ সমাজে সফর করে আসার জন্য এ বইটি হাতে তুলে নিলে পাঠক যে একটুও ঠকবে না সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়।

(শরীফ মুহাম্মদ)
সহ-সম্পাদক দৈনিক আমার দেশ।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯।
যোগাযোগ ঃ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

⇨ **তারবিয়াতুস সালিক**
মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

স্যায়িদ আবুল হাসান আলী নদভী ঃ
⇨ **এমন ছিলেন তিনি**
মূল ঃ ড. ইউসুফ কারজাভী
অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

দাম্পত্য-জীবনের সেরা সংবিধান
⇨ **তুমি সেই রাজা .. তুমি সেই রানী ..**
মূল ঃ মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
অনুবাদ ঃ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা
⇨ **ইয়েমেনে একশত বিশদিন**
লেখক ঃ প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

প্রকাশের অপেক্ষায় ..

⇨ **নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

শিশু-কিশোর সিরিজ-আশারায়ে মুবাশশারা (১-১০)
⇨ **ওহীর সংবাদঃ ওরা জান্নাতী**
লেখক ঃ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

‘তোমার স্মরণে হে রাসূল!’ যে সীরাত বিষয়ক একটি কিতাব তা তো শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে! সুতরাং এখন শুধু বলতে হবে সীরাত বিষয়ক অন্যান্য কিতাবের সাথে এ কিতাবের পার্থক্য কোথায়? অতি সংক্ষেপে বলা যায়- এ কিতাব হলোঃ নবীজীকে নিবেদিত এক নবী-প্রেমিকের আবেগ-মথিত ‘একগুচ্ছ’ পঙ্‌ক্তিমালা। অর্থাৎ এ কিতাব যিনি লিখেছেন তিনি শুধু কলমের কালি দিয়ে তা লিখেন নি, কালো কালো কালির সাথে মিশে আছে সোনা সোনা ভালোবাসা! এ ভালোবাসা আবার যেনতেনভাবে প্রকাশ করেন নি তিনি, প্রকাশ করেছেন ভালোবাসা-মুগ্ধ আবেগের স্নিগ্ধ-কোমল মিশেলে! না, দাঁত-ভাঙা কঠিন ভাষায় অবোধগম্য করে নয়-ঝরঝরে সাবলীল বর্ণনায় প্রকাশ করেছেন তিনি ভালোবাসার এ পঙ্‌ক্তিমালা!!

প্রিয় পাঠক! এ কিতাব পড়তে হবে আপনাকে, পড়তেই হবে! না হলে বঞ্চিত হবেন এক রাসূল-প্রেমিকের সাথে রাসূল প্রেমের স্বচ্ছ সরোবরে অবাঁধ সাঁতার কাটার নির্মল আনন্দ থেকে! এমন বঞ্চনা কে চায়? .....

রাহনুমা প্রকাশনী™
যোগাযোগ : মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫